

# জনৈক ফারুক কোরেশীর ভ্রান্তি

বেলায়েত মাহমুদ-এর সৌজন্যে

শায়েখ আব্দুল্লাহ আল মুনীর

প্রথম প্রকাশ:

রবিউস সানী-১৪৩৯ হিজরী

জানুয়ারী-২০১৮ ইংরেজী

প্রিন্টিং ও বাঁধাই

মুসলিম প্রিন্টার্স

দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা।

মোবাঃ ০১৯৩১-৪৪১২১৪

bestkitab.weebly.com

almunirabdullah@gmail.com

মূল্যঃ ৪৫ টাকা।

# সুচিপত্র

ভূমিকা:.....	৪
ফারুক কোরেশীর মতবাদের খন্ডয়ন.....	৭
১ নং বিভ্রান্তিঃ- কোরআন বিরোধী হাদীস মানা যাবে না ।.....	৮
- কুরআনের সাথে হাদীসের বিরোধ মনে হলে করণীয় .....	১৪
২ নং বিভ্রান্তিঃ- শব্দ নিয়ে খেলা.....	২৩
৩ নং বিভ্রান্তিঃ- উপার্জিত সম্পদে নিসাব শর্ত নয় ।.....	৩১
৪ নং বিভ্রান্তিঃ- উপার্জিত সম্পদে বছর গননার বিষয়টি অস্বীকার করা ।.....	৩৬
৫ নং বিভ্রান্তিঃ- উপার্জিত সম্পদ থেকে ধনী গরীব সবাইকে যাকাত দিতে হবে ৩৭	
৬ নং বিভ্রান্তিঃ- যাকাত কবুল হওয়ার জন্য ধর্মীয় নেতার হাতে প্রদান করা শর্ত। .....	৪৮
৭ নং বিভ্রান্তিঃ- মসজিদ-মাদ্রাসায় বা যে কোনো দ্বীনী কাজে যাকাতের মাল খরচ করা । .....	৫০
৮ নং বিভ্রান্তিঃ- যাকাত প্রদান না করলে কাফির হয়ে যায় ।.....	৫২

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد

ভূমিকা:

মহান রব্বুল আলামীন বলেন,

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

প্রথম যুগের মুহাজির ও আনসাররা এবং পরবর্তীতে যারা উত্তমভাবে তাদের অনুসরণ করেছে আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তারও তার উপর সন্তুষ্ট হয়েছে।

[তাওবা/১০০]

এই আয়াতে আনসার ও মুহাজির সাহাবা এবং তাদের যারা অনুসরণ করে চলেছে তথা পরবর্তী যুগে ইসলামগ্রহণকারী সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেয়ীরা মহান রব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি হাসিল করেছেন বলে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে। এখানে আনসার ও মুহাজির সাহাবাদের কথা উল্লেখ করার পর তাদের উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট এবং আমভাবে যারা তাদের অনুসরণ করে তাদের উপরও আল্লাহ সন্তুষ্ট এমন বলা হয়েছে। অতএব প্রথম যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত প্রতিটি যুগেই যারা সাহাবায়ে কিরামকে অনুসরণ করে চলেবে তারা এর মধ্যে পড়বে।

হাদীসে এসেছে রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, (خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ) “আমার উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম হলো আমার যুগে যারা আছে। তারপর তাদের পরের যুগ, তারপর তাদের পরের যুগ” [বুখারী ও মুসলিম]

এই হাদীসে আমরা দেখছি, আল্লাহর রসুলের যুগে যারা ছিলো অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরাম ও তাদের পরের যুগ তথা তাবেয়ী এবং তাদের পরের যুগ তথা তাবা-তাবেয়ীদের এই উম্মতের সর্বোত্তম ব্যক্তি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। অন্য বর্ণনায় এসেছে, এর পর এমন কিছু লোক আসবে যারা (يَشْهَدُونَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدُوا) “সাক্ষ্য চাওয়ার আগেই সাক্ষ্য দেবে” [মুসলিম] অর্থাৎ কোনো বিষয়ে তাদের মতামত না চাইতেই আগ বাড়িয়ে মতামত দেওয়া শুরু করবে। অনেকটা ‘গায় মানে না আপনে মোড়োল’ মতো অবস্থা। বর্তমানে আমরা সেরকম অবস্থাই দেখছি। আমরা দেখছি, কিছু অজ্ঞ ও মুর্থ লোক ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে কুরআন হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা করে সাহাবা, তাবেয়ী, তাবা-তাবেয়ী ইত্যাদি যুগের সর্বোত্তম মানুষদের মতামতকে খন্ডায়ন করার মতো ধৃষ্টতা

দেখাচ্ছে। তারা না আরবী বোঝে, না ইবারত বোঝে আর না আছে হাদীস বা ফিকহের উসুল সম্পর্কে জ্ঞান। সেই সাথে কুরআনের আয়াত বা হাদীসের রেওয়য়াত সম্পর্কেও তাদের অজ্ঞতার কোনো সীমা নেই। এই অজ্ঞতাকে পুঁজি করেই তারা সাহাবায়ে কেরামসহ পূর্ব যুগের সকল বরণ্য ওলামায়ে কিরামের মতামতকে খন্ডায়ন করে নতুন মতবাদ প্রতিষ্ঠা করে যাচ্ছে। মজার ব্যাপার হলো, এই নতুন মতবাদকেই তারা রসুলের রেখে যাওয়া ইসলাম এবং আল্লাহপ্রদত্ত অকাট্য বিধান হিসেবে গণ্য করছে। যার বিপরীতে যে কেউ মত দিলেই তাকে জালেম-কাফের বা কমপক্ষে ফাসেক হিসেবে আখ্যায়িত করছে। কথায় বলে, ‘চোরের মার বড় গলা।’ কোথায় দ্বীনের মধ্যে নতুন মত তথা বিদয়াত সৃষ্টি করার কারণে তারা লজ্জিত হবে তা না করে উল্টো ঐ বিদয়াতকে মেনে না নেওয়ার কারণে পুরা মুসলিম উম্মাকেই তারা বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট হিসেবে ঘোষণা করছে। কেউ কেউ বলেন, অনেক পাগল নাকি অন্য সকল সুস্থ লোককে পাগল মনে করে তাই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় সবার দিকে তাকিয়ে কেবলই হাসে। এসব লোকের অবস্থাও হয়েছে তাই। এ ব্যাপারে রসুলুল্লাহ ﷺ অবশ্য পূর্ব থেকেই সতর্ক করে গেছেন। তিনি বলেছেন,

وَلَكِنْ يَفْضِلُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَلًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا

সত্যিকার আলেমদের মৃত্যুর মাধ্যমে জ্ঞান তুলে নেওয়া হয় এমনকি অবস্থা এমন হয় যে কোনো যোগ্য আলেমই আর অবশিষ্ট থাকে না। তখন মানুষ মুর্থ লোকদের নেতা মানে আর তাদের নিকট ফতোয়া চায় আর তারা জ্ঞান ছাড়া ফতোয়া দেয়। ফলে তারাও পথভ্রষ্ট হয় অন্যকেও পথভ্রষ্ট করে। [বুখারী]

বলা বাহুল্য যে, এখানে যেহেতু অজ্ঞ লোককে নেতা বানানোর কথা বলা হচ্ছে এবং তার নিকট ফতোয়া চাওয়ার কথা বলা হচ্ছে তাই বোঝা যায় এখানে রাজনৈতিক নেতা নয় বরং ধর্মীয় নেতার কথা বলা হচ্ছে। অর্থাৎ সত্যিকার আলেমদের অবর্তমানে কিছু অজ্ঞ ও মুর্থ লোককে মানুষ ধর্মীয় নেতা হিসেবে গ্রহণ করবে এবং সে জ্ঞান ছাড়াই উল্টা-পাল্টা ফতোয়া দিয়ে তাদের পথভ্রষ্ট করবে এমন খবর রসুলুল্লাহ ﷺ অনেক আগেই জানিয়ে দিয়েছেন। বর্তমানে যুগ চলছে তেমনই। যেসব মুফতি-মাওলানা নিজেদের যোগ্য আলেম হিসেবে ঘোষণা দিয়ে মসজিদ মাদ্রাসা দখল করে রয়েছেন তাদের জ্ঞান হাফপ্যান্ট পড়া বাচ্চাদের চেয়ে কম হবে বৈ বেশি নয়। একারণেই প্রচলিত সব বিদয়াতের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান গ্রহণের বদলে কেউতো সরাসরি তাদের ভক্তই

হয়ে গেছেন আবার অনেকেই মাঠ খালি করে নিরবে ধ্যান করতে বসেছেন। সেই ফাঁকে অজ্ঞ ও মুর্থ লোকেরা যা খুশি বাতিল মতবাদ ছড়িয়ে সাধারণ মুসলিমদের দলে ভিড়িয়ে নিচ্ছে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, অনেক বুদ্ধিমান ও নিষ্ঠাবান যুবকও অনেক সময় এদের জালে ধরা পড়ে বিভ্রান্ত হচ্ছে।

এই সকল মতবাদের মধ্যে একটি হলো, কুষ্টিয়ার জনৈক ফারুক কোরেশীর উদ্ভাবিত যাকাত ব্যবস্থা। যাকে তিনি “আল্লাহ প্রদত্ত অর্থনীতি” হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। যার মূল বক্তব্য হলো, উপার্জিত সম্পদে কোনো নিসাব বা বছর গণনার প্রয়োজন নেই বরং প্রতিদিনকার উপার্জনের আড়াই পারসেন্ট ধর্মীয় নেতার হাতে যাকাত হিসেবে প্রদান করতে প্রতিটি মুসলিম বাধ্য। এ হিসেবে, কোনো দিনমজুর যদি কাজের অভাবে পরিবারসহ দু’দিন না খেয়ে থাকে আর পরে একদিন কারো বাড়িতে কামলা খেটে ১০০ টাকা উপার্জন করে তবে নিজের স্ত্রী সন্তানদের উপর ব্যয় করার আগেই তাকে আড়াই টাকা যাকাত হিসেবে ধর্মীয় নেতার হাতে প্রদান করতে হবে তার পর পরিবারে ব্যয় করবে। একইভাবে যার মাসিক বেতন পাঁচ হাজার টাকা সে বেতন পাওয়ার সাথে সাথেই ১২৫ টাকা ধর্মীয় নেতাকে যাকাত হিসেবে প্রদান করবে। এখানেই শেষ নয়, যদি কেনো দিনমজুর বা চাকুরিজীবী নিজের বেতন আগাম গ্রহণ করে তবে তৎক্ষণাত্ তাকে তার যাকাত প্রদান করতে হবে যেমনটি আল্লাহ প্রদত্ত অর্থনীতি নামক পুস্তিকার ২৮ পৃষ্ঠায় তিনি উল্লেখ করেন। প্রশ্ন হলো, মজুরী গ্রহণ, যাকাত প্রদান এবং এমনকি তা গরীবদের মাঝে বন্টনের পর যদি কোনো কারণে এই দিনমজুর বা চাকুরিজীবী তার চুক্তি হতে সরে আসে তবে কি হবে? উদাহরণস্বরূপ, ধরে নিই একজন ব্যক্তি কোনো কার্টিমিস্ত্রির নিকট কয়েকটি বড় বড় আসবাবপত্র বানানোর চুক্তি করলো। তার মজুরী হিসেবে ১ লক্ষ টাকা তাকে আগাম প্রদান করলো। ধর্মীয় নেতা লোক পাঠিয়ে ঐ দিনই তার কাছ থেকে যাকাত হিসেবে ২৫০০ টাকা আদায় করে নিলো এবং যথা নিয়মে তা গরীবদের মাঝে বন্টনও করে দিলো। কদিন পর ঐ ব্যক্তি ফিরে এসে বলল, আপাতত তার আসবাবপত্রের প্রয়োজন নেই। ফলে পুরা এক লক্ষ টাকা ফেরত নিয়ে গেলো। এখন এই ব্যক্তি কি করবে? আদায় করা যাকাতের টাকা তো সে ফেরত পেতে পারে না। যেহেতু রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, (فَإِنَّ الْعَانِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَغُودُ فِي فَيْئِهِ) “যে তার সদাকা ফেরত নেয় সে ঐ কুকুরের মতো যে বমি করার পর তা গিলে ফেলে”। [বুখারী ও মুসলিম] তাছাড়া মহান রব্বুল আলামীন নিজেই বলেন, (لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ) “খোটা দিয়ে বা কষ্ট দিয়ে তোমাদের সদাকাকে বিনষ্ট করো না” [বাকার/২৬৪] চিন্তা করার বিষয় হলো, গরীব মানুষকে দান করার পর আবার তাদের

ডেকে ডেকে বা ধরে ধরে তা ফেরত নেওয়ার মতো হীন কাজ আর কি হতে পারে! ঐ ব্যক্তি যদি ধনী হয় তবে ধর্মীয় নেতা যাকাতের ফান্ড থেকেও ঐ ব্যক্তির ক্ষতিপূরণ করতে পারেন না যেহেতু যাকাতের মাল ধনীদের জন্য নয়। তাহলে এই ব্যক্তির ক্ষেত্রে ২৫০০ টাকা খরচা হওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। অথচ এখানে তার উপার্জন কিছুই হচ্ছে না। উল্টো ২৫০০ টাকা ঘর থেকে দেওয়া লাগছে। বড় বড় ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে এমন ঘটনা মাঝে মাঝেই ঘটতে পারে। এই মতবাদে যাকাতের নামে মাঝে মাঝেই তারা ক্ষতির শিকার হতে পারেন। এমন আরো অনেক অমূলক ব্যাপার এই মতবাদের মধ্যে রয়েছে যা কুরআন-হাদীস এবং সুস্থ বিবেকের আলোকে অগ্রহণযোগ্য প্রমাণিত। এই গ্রন্থে সে বিষয়ে সংক্ষেপে আলোকপাত করতে চাই। আর আল্লাহই তৌফিকদাতা।

### ফারুক কোরেশীর মতবাদের খন্ডায়ন

মহান রব্বুল আলামীন কিতাব নাযিল করেছেন এবং রসূল প্রেরণ করেছেন মানুষকে হেদায়েত দেওয়ার জন্য। তাই সঠিক নিয়মে কুরআন-হাদীস অধ্যয়ন করলে হক পথ থেকে কেউ বিচ্যুত হয় না বরং হক পথ পায়। কিন্তু বাঁকা পথে কুরআন-হাদীসের অপব্যখ্যা করলে মানুষ সহজেই সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়। মহান রব্বুল আলামীন নিজেই এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন। পবিত্র কুরআনের আয়াত সম্পর্কে তিনি বলেন,

مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ

তার মধ্যে কিছু স্পষ্ট আয়াত আছে। সেগুলো কিতাবের মূল অংশ। আর কিছু আছে অস্পষ্ট আয়াত। যাদের অন্তরে বক্রতা আছে তারা ফেতনা সৃষ্টির জন্য অস্পষ্ট আয়াতের পিছনে লাগে। [আলে-ইমরান/৭]

বক্র চিন্তাভাবনার মানুষরা চিরকাল এই একই পন্থা অবলম্বন করে আসছে। বিদয়াতী মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য তারা বড় ছোট বিভিন্ন রকম বিভ্রাট ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। নানা বিষয়ে গোজামিল দেয়। সেসব গোজামিলে অনেক সময় বুদ্ধিমান লোকেরও ধাঁধা লেগে যায়। তবে সুষ্ঠুভাবে চিন্তা-গবেষণা করলে সেসব বিভ্রান্তির জট খুলে ফেলা যায় এবং হক বাতিলের মাঝে পার্থক্য নিরূপন করা যায়। কোরেশী সাহেব এবং তার অনুসারীরাও যাকাতের ব্যাপারে এমন কিছু বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছেন। নিচে বিভিন্ন বিষয়ে তাদের মৌলিক বিভ্রান্তিসমূহের জবাব দেওয়া হলো।

## ১ নং বিভ্রান্তিঃ- কোরআন বিরোধী হাদীস মানা যাবে না।

‘ফারুকী ফিতনা নামক পুস্তিকার জওয়াব’ নামক পুস্তিকায় ফারুক কোরেশী লেখেন, “কুরআন বিরোধী হাদীস ও হাদীস বিরোধী মানুষের ফতওয়া বা মতবাদ মান্য করা নিষিদ্ধ”। [২২ পৃষ্ঠা]

এই কথার স্বপক্ষে তিনি আনয়াম/১১৬ ও ১২১, নিসা/৫৯ এবং নিসা/৬৪ ইত্যাদি আয়াত উল্লেখ করেছেন। যেখানে মানুষের অনুসরণ থেকে সতর্ক করা হয়েছে এবং যে কোনো মতপার্থক্য আল্লাহ ও রসুলের দিকে ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে সূরা নিসার ৬৪ নং আয়াতের তিনি খুব আজব একটা অনুবাদ করেছেন। তিনি লিখেছেন,

এবং আমরা কোনো রসুলকেই প্রেরণ করি নাই যে আমার আদেশ ব্যতিতই তাঁহাদের অনুসরণ করিতে হইবে। [নিসা/৬৪]

এই অনুবাদ থেকে বোঝা যায় আরবী তো বটেই এমনকি বাংলা ভাষাতেও তার অদক্ষতা রয়েছে। আরবীতে ব্যবহৃত (أمر) শব্দে বহুবচন আছে বলেই বাংলাতেও আমরা লেখা, রসুলকে কথাটা একবচন হওয়া সত্ত্বেও পরে তাকে না বলে তাহাদের বলা ইত্যাদি ছোটখাটো বিষয় বাদ দিলেও এখানে দুটি বড় ভুল হয়েছে।

**প্রথমতঃ** সহজ-সরলভাবে চিন্তা করলেই দেখা যাবে অনুবাদে যে বাংলা লেখা হয়েছে তা পুরোপুরি ভুল একটা অর্থ প্রকাশ করে যা আমরা কেনো খোদ কোরেশী সাহেবও আসলে বিশ্বাস করেন না। অনুবাদের অর্থ দাঁড়াচ্ছে আল্লাহ বলছেন, আমি কোনো রসুলকেই প্রেরণ করি নাই। অতএব আমার আদেশ ব্যতিত তাকে অনুসরণের প্রয়োজনও নাই। উদাহরণস্বরূপ যদি কেউ বলে, আমি কাউকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করি নাই যে আমার ইচ্ছা ছাড়া তার ভরণ-পোষণ বহন করতে হবে। এই কথার স্পষ্ট অর্থ দাড়ায়, এই ব্যক্তি আসলে স্ত্রী হিসেবে কাউকে গ্রহণই করিনি তাই তার ভরণ-পোষণ দিতে বাধ্য নয় তবে স্বেচ্ছায় দিলে দিতে পারে এমন কিছু বলতে চাচ্ছে। উপরোক্ত অনুবাদের অর্থও হয়েছে এমন। তবে আমরা জানি ফারুক কোরেশী এটা বোঝাতে চাননি। তবে ভাষা জ্ঞানের অভাবের কারণে কথাটা এমন হয়ে গেছে। তার বলা উচিত ছিলো “এবং আমি কোনো রসুলকেই এই নির্দেশ দিয়ে পাঠাই নাই যে, আমার আদেশ ব্যতিতই তাঁকে অনুসরণ করিতে হইবে।” এই নির্দেশ দিয়ে পাঠাই নাই আর একেবারে পাঠাই নাই বলার মাঝে কি পার্থক্য আশা করি বুদ্ধিমান পাঠক তা অনুধাবন করতে পারবেন।



দ্বিতীয়তঃ এসব ভুলভ্রান্তি বাদ দিলেও তিনি যা বোঝাতে চেয়েছেন আয়াতের মূল অনুবাদ মোটেও তা নয়। তিনি বলতে চেয়েছেন, আয়াতের উদ্দেশ্যে হলো, আমার নির্দেশ ব্যাতিত রসুলকে মানা হবে এ জন্য আমি রসুল পাঠায়নি বরং তাকে মানতে হবে আমার নির্দেশে। এই অনুবাদ থেকে মনে হয় আয়াতটি মূলত এসেছে আল্লাহর নির্দেশ ছাড়াই আগ বাড়িয়ে রসুলের কথা মানার ব্যাপারে সতর্ক করার জন্য। অর্থাৎ রসুলের কথা দুই ভাগে বিভক্ত যার একটি মানার ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ রয়েছে তাই তা মানতে হবে আর অন্যটির নির্দেশ নেই তাই তা মানা যাবে না। একারণেই তিনি বলেছেন, কুরআন বিরোধী হাদীস মানা যাবে না। অথচ আয়াতের অনুবাদ হলো এর উল্টো আর তা হলো, “আল্লাহর নির্দেশে রসুলকে মেনে চলা হবে এই উদ্দেশ্যে ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে আমি রসুলকে প্রেরণ করি নাই। [নিসা/৬৪] এই অনুবাদের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় রসুলকে মেনে চলার ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ আছে বিধায় তাকে সবাই মেনে চলবে এই উদ্দেশ্যেই রসুলকে প্রেরণ করা হয়েছে। এই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অনেকের নিকট অস্পষ্ট মনে হতে পারে। কারো মাথা আউলিয়েও যেতে পারে। এই আয়াতে (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) “আল্লাহর নির্দেশে” কথাটা উল্লেখ আছে বিধাই এই জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। এই কারণেই ফিতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কোরেশী সাহেব এই আয়াতটাকে বাছাই করেছেন অথচ বহু সংখ্যক আয়াতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, (أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) “তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রসুলের আনুগত্য করো” [নিসা/৫৯, মায়দা/৯২, নূর/৫৪, নূর/৫৬, মুহাম্মদ/৩৩, তগাবুন/১২] এই সকল আয়াতের কোনোটিতে রসুলের আনুগত্য করার নির্দেশ দেওয়ার পরই (وَاحْذَرُوا) “আর সতর্ক থাকো” [মায়দা/৯২], (وَلَا تُطِئُوا أَغْمَالَكُمْ) “আর তোমাদের আমলকে বিনষ্ট করো না” ইত্যাদি নানা হুমকী দেওয়া হয়েছে। যার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, রসুলের আনুগত্য না করার পরিণতি ভয়াবহ। সূরা আহযাবের ৩৬ নং আয়াতে আল্লাহ বা তার রসুল কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিলে মুমিনদের কোনো (خِيَرَةٌ) বা স্বাধীনতা থাকে না এবং সূরা নূরের ৫১ নং আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ ও রসুলের হুকুমের দিকে ডাকা হলে মুমিনরা কেবলই বলে, (سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا) “আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম”। এছাড়া সূরা নিসার ৬৫ নং আয়াতে রবের কসম করে বলা হয়েছে, আল্লাহর রসুল যে বিচারই করেন তা মেনে নিতে কেউ সামান্যও সংকোচ বোধ করলে তার ঈমানই থাকবে না। সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াতটি তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন। যেখানে যাবতীয় মতপার্থক্য আল্লাহ ও রসুলের দিকে ফিরিয়ে দিতে বলা হয়েছে। কিন্তু তিনি এই সব স্পষ্ট আয়াত থেকে কুরআন বুঝার চেষ্টা না করে ফেতনাবাজদের মতো যে আয়াতে কিছুটা অস্পষ্টতা

রয়েছে সেটা সামনে এনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। ঐ সকল আয়াতে বিধি-বিধান দেওয়ার ক্ষেত্রে মহান রব্বুল আলামীন রসুলকে পরিপূর্ণ অধিকার প্রদান করেছেন। যে আয়াতে বলা হচ্ছে “আল্লাহর নির্দেশে রসুলের আনুগত্য করতে হবে” সে আয়াতে কোনো জটিলতা নেই। যেহেতু অন্য বিভিন্ন আয়াতে ছোট বড় সব ব্যাপারে রসুলুল্লাহ ﷺ কে মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অতএব যে বিষয়েই রসুলুল্লাহ ﷺ কে আনুগত্য করা হোক তা আল্লাহর নির্দেশেই হচ্ছে। অতএব, আল্লাহ ﷻ কোনো বিধান দিলে যেমন তা বিনাবাক্যে অনুসরণ করতে হয় রসুল ﷺ কোনো বিধান দিলেও তা বিনাবাক্যে অনুসরণ করতে হয় এটাই প্রমাণিত হয়। যারা এক্ষেত্রে আল্লাহ ও রাসুলের মাঝে কোনো পার্থক্য করতে চায় তাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا \*  
أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا

যারা আল্লাহ ও তার রসুলের মাঝে পার্থক্য করতে চায় আর বলে আমরা কিছু মানবো আর কিছু অস্বীকার করবো আর মাঝামাঝি রাস্তা তালাশ করে তারাই প্রকৃত কাফের।

[নিসা/১৫১]

এটা প্রমাণ করে রসুলকে না মানাও কুফরী হিসেবেই গণ্য। উক্ত জওয়াব গ্রন্থে কোরেশী সাহেব নিজেই বিষয়টি স্বীকার করেছেন তিনি বলেন, “রসুলে (দঃ) এর সুন্নাতকে অস্বীকার করাও কুফরী” [বিশ পৃষ্ঠা] অথচ পরবর্তীতে তিনি মাঝে মাঝেই রসুলুল্লাহ ﷺ এর বিভিন্ন বক্তব্যকে অস্বীকার করেছেন। বা হাদীসের মধ্যে নিজের মত ঢুকিয়েছেন যেমনটি পরে আমরা স্পষ্ট করবো।

এরপর ফারুকী সাহেব আরো বড় ধরনের ফাঁকিবাজির আশ্রই নিয়েছেন। কুরআন বিরোধী হাদীস না মানার ব্যাপারে তিনি দারে কুতনী থেকে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। হাদীসে এসেছে, রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

كَأَمِي لَا يَنْسَخُ كَلَامَ اللَّهِ وَكَأَمِي يَنْسَخُ كَلَامِي وَكَأَمِي يَنْسَخُ بَعْضُهُ بَعْضًا

আমার কথা আল্লাহর কথাকে মানসুখ করে না বরং আল্লাহর কথা আমার কথাকে মানসুখ করে আর আল্লাহর কথা আল্লাহর কথাকে মানসুখ করে। [দারে কুতনী]

মজার ব্যাপার হলো, কোরেশী সাহেব উক্ত জওয়াব গ্রন্থের ২৪ পৃষ্ঠায় হুজুরদের নিন্দা করে বলেন, “হাদীস যেটুকু উল্লেখ করিয়াছেন তাহাও সহি হাদিসের অন্তর্ভুক্ত নয়”। এ কথা থেকে বোঝা যায় হাদীস সহীহ-জয়ীফ হওয়ার ব্যাপারে তিনি কিছুটা জ্ঞান

রাখেন। অথচ এখন দেখা যাচ্ছে তিনি নিজেই নিজের মতবাদের পক্ষে যে হাদীসটি পেশ করেছেন তা সহীহ তো নয়ই এমনকি যযীফও নয় বরং জাল। যেহেতু তার সনদে জাবরুন ইবন ওয়াকিদ নামক রাবী রয়েছে যার ব্যাপারে জাল বর্ণনার অভিযোগ রয়েছে। বোঝা গেলো, অন্যরা কথা বললে সহীহ হাদিস বলতে হবে কিন্তু কোরেশী সাহেবের জাল-যযীফ যে কোনো হাদীস দেওয়ার অধিকার আছে।

তাছাড়া কোরেশী সাহেবের মূলনীতিতে বলা যায়, এই হাদীসটি নিজেই কুরআন বিরোধী। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন, (مَا نَسْخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا) “আমি যে আয়াতই মানছুখ করি না কেনো তার বদলে উত্তম বা সমপর্যায়ের আয়াত আনয়ন করি”। [বাকারা/১০৬] এখানে দেখা যাচ্ছে কেবল আয়াত দ্বারা আয়াতকে মানছুখ করা হয়। তাহলে উক্ত হাদীসে যে আয়াত দ্বারা রসুলের কথা তথা হাদীসকে মানছুখ করা হয় বলা হয়েছে তা কুরআনবিরোধী হওয়ার কারণে পরিত্যক্ত। এখন যদি কেউ বলে রসুলের বাণী তথা হাদীসকেও আয়াত বলা যায় যেহেতু একটি হাদীসে এসেছে, (تَلَوْنَا عَنِّي وَلَوْ آيَةً) “আমার নিকট থেকে পোঁছে দাও যদিও একটি আয়াত হয়”। [বুখারী] তাকে বলা হবে তাহলে প্রমাণিত হলো, রসুলের কথাও আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। যেহেতু পবিত্র কুরআনে মহান রসুল আলামীন বলেছেন (أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ) “আমি সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেছি”। [মুজাদিলা/৫] এখন প্রশ্ন হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ রসুলুল্লাহ ﷺ কিভাবে তাকে (১৫ম) তথা আমার কথা হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ আয়াতকে নিজের কথা হিসেবে চালিয়ে দেওয়া কি তার জন্য বৈধ হয়? এ ব্যাখ্যার আলোকেও হাদীসটি কুরআনবিরোধী প্রমাণিত হয় এবং বাতিল হয়ে যায়। দেখা যাচ্ছে কোরেশী সাহেব এমন একটি হাদীস থেকে নিজের মতামত প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যা অন্য সকল মুহাদিস তো বটেই এমনকি তার নিজের মতেই বাতিল হিসেবে গণ্য।

অন্য আরেকটি যুক্তিতেও এই মতবাদকে খন্ডায়ন করা যায়। উপরে আমরা দেখেছি কোরেশী সাহেব বলেছেন, রসুল (দঃ) এর সুল্লাত অস্বীকার করাও কুফরী। [উক্ত জওয়াব গ্রন্থ-২০ পৃষ্ঠা] তাছাড়া অন্য স্থানে তিনি রসুলের সুল্লাকে আকড়ে ধরার কথাও বলেছেন [১৩ পৃষ্ঠা] এমনকি হুজুরগণ দাবী করেছিলেন তিনি নাকি কেবল কুরআন মেনে চলেন এটা খন্ডায়ন করে তিনি বলেন, “আমি বারবার আল্লাহ ও তাহার রসুলকে অর্থাৎ কুরআন ও হাদীসকে মানিয়া চলার জন্য বলিতেছি এবং কুরআন ও হাদিস বিরোধী কোনো কিছুই মান্য করা যাইবে না। [২৪ পৃষ্ঠা]

মহান রব্বুল আলামীন বলেন, (اَتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ) “তোমাদের রবের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তোমরা তাই মেনে চলো তা ছাড়া অন্য কোনো বন্ধু বা অভিভাবকের অনুসরণ করো না। [আরাফ/৩] আয়াতে মহান রব যা অবতীর্ণ করেছেন তা বাদে কোনো বন্ধু বা অভিভাবককে মেনে চলতে নিষেধ করা হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হলো, আল্লাহ কি কেবলই কুরআন অবতীর্ণ করেছেন নাকি রসুলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাহ তথা হাদীসে বর্ণিত বিধানও আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন। যদি কেউ বলে আল্লাহ কেবল কুরআন অবতীর্ণ করেছেন তবে তো রসুলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাহ বা হাদীসকে মান্য করার কোনো আবশ্যিকতা নেই। উপরোক্ত আয়াত অনুযায়ী মুসলমান কেবল ততটুকু মানতে বাধ্য যতটুকু মহান রব অবতীর্ণ করেছেন। তার বাইরে এক চুল মানতে মুসলিম বাধ্য নয়। এখন যদি সুন্নাহ বা হাদীস আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ নাই হয়ে থাকে তবে কুরআন বিরোধী হোক বা না হোক সুন্নাহ বা হাদীস থেকে অতিরিক্ত বিধান কোনো প্রমাণ করা হবে?

এটা আমরা সবাই জানি যে, পবিত্র কুরআনের কোথাও সোনা-রোপা তথা অর্থ-কড়ি, পশু, ফসল ইত্যাদি কোনো প্রকারের যাকাতের পরিমাণ নির্ধারন করা নেই। আড়াই পারসেন্ট কি চল্লিশটায় একটা ইত্যাদি যাবতীয় কথা বর্ণিত আছে হাদীসে। কুরআনে উল্লেখ আছে কেবল ব্যয় করার কথা। সেই মতে উপার্জিত অর্থের সম্পূর্ণই ধর্মীয় নেতার হাতে প্রদান করা উচিত। পরবর্তীতে ধর্মীয় নেতা তা সবার মাঝে সমান ভাবে ভাগ করে দেবেন। এভাবে ইসলামী সমাজের সকল সদস্য সমান দুঃখ কষ্ট বা সমান স্বচ্ছলতা ভোগ করতে পারবে। সেক্ষেত্রে ইসলামের অর্থনীতি হয়ে যাবে নাস্তিক্যবাদি সমাজতন্ত্রের মতোই। যাকাতের নির্দিষ্ট পরিমাণ, নেসাব বা সময় সম্পর্কে যত হাদীস, সবগুলো পরিত্যাগ করে কেবল পবিত্র কুরআনের উপর নির্ভর করলে এমন একটা মতবাদ ফারুক কোরেশী গ্রহণ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি। তিনি যাকাতকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন, উপার্জনের যাকাত আর গচ্ছিত সম্পদের যাকাত। গচ্ছিত সম্পদের যাকাতে তিনি আড়াই পারসেন্ট, নিসাব, বছর ইত্যাদি সব বিধানই মেনে নিয়েছেন যা মূলত হাদীসে বর্ণিত আছে আর উপার্জনের যাকাতে নিসাব ও বছর না মানলেও আড়াই পারসেন্টের ব্যাপারটি স্বীকার করেছেন। সেটাও কিন্তু তিনি হাদীস থেকে গ্রহণ করেছেন কুরআন থেকে নয়।

ভাল আরবী জানা থাকলে তিনি অবশ্য কিছু আয়াত থেকে এর পক্ষে প্রমাণ দিতে পারতেন। যেমন মহান আল্লাহ বিভিন্ন আয়াতে বলেছেন, (مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ) “আমি যা

রিযিক দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যয় করে”। [বাকদ্বারা/৩] একটি আয়াতে এসেছে, (انْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ) “তোমাদের যে হালাল উপার্জন আমি প্রদান করেছি তা থেকে ব্যয় করো” [বাকারা/২৬৭] এ আয়াতে মিন (من) শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে যার সোজা বাংলা হলো, থেকে। তবে অনেক সময় তা কিছু অংশে অর্থে ব্যবহৃত হয়। বাংলাতে চিন্তা করলেও বিষয়টা বোঝা যায়। যদি কাউকে বলা হয় হাড়িতে যে চাল আছে তা নিয়ে এসো তাহলো পুরো চালই আনতে হবে এমন বোঝায় কিন্তু হাড়ি থেকে চাল নিয়ে এসো বললে সম্পূর্ণ নয় বরং কিছু অংশ নিয়ে আসতে হবে এটাই বোঝা যায়। যাই হোক এভাবে চিন্তা করলে কুরআন থেকে উপার্জনের সম্পূর্ণ অংশ নয় বরং কিছু অংশ দান করতে হবে এমন বোঝানো সম্ভব। তবু সেই কিছু অংশ কতটুকু তা তো প্রমাণ করা যায় না ফলে যে কেউ নিজ ইচ্ছামতো যে কোনো অংশ দান করলেই যথেষ্ট বিবেচিত হয়। সেক্ষেত্রে কেউ একশ টাকায় ২.৫ টাকা না দিয়ে এক টাকা বা তার চেয়ে কম দিলেও কিছু অংশ দেওয়া হয়েছে বলে প্রমাণিত হয় ফলে যাকাতের বিধান আদায় হয়ে যায়। কিন্তু ফারুক কোরেশী এতটা সহজ করতে চান নি। তিনি চেয়েছেন কঠিন করতে তাই কমপক্ষে ২.৫ পারসেন্টই দিতে হবে এটা প্রমাণ করার জন্য হাদীস ব্যবহার করেছেন। অথচ অন্য অনেক বিষয়ে তিনি আবার বিভিন্ন হাদীসকে কুরআনবিরোধী আখ্যায়িত করে পাশ কাটিয়ে গেছেন। এখানেও তো এমন বলা যেতো যে মহান আল্লাহ আমভাবে কিছু অংশ ব্যয় করতে বলছেন আর হাদীসে আড়াই পারসেন্টের কথা বলা হচ্ছে অতএব এটা কুরআন বিরোধী হওয়ার কারণে পরিত্যক্ত। এসবই তার দ্বিমুখিতার পক্ষে সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। এক কথায় বলা যায় রসুল ﷺ এর সুন্নাহ বা হাদীস যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ বিধান হিসেবে গণ্য নাই হয় তবে কোনো ক্ষেত্রেই হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করা যাবে না। যেহেতু মহান আল্লাহ তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ বিধান ছাড়া অন্য সকল কিছু অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন। তা না করে নিজের মন মতো কিছু হাদীসকে গ্রহণ করা আর কিছু হাদীসকে পরিত্যাগ করার নীতি অবশ্যই পাগলামী হিসেবে গণ্য। সেই পাগলামী আরও স্পষ্ট হয় যখন দেখা যায় নিজের পক্ষে হলে দারে কুতনীতে বর্ণিত একটি জাল হাদীস থেকেও দলীল দেওয়া হচ্ছে অথচ মতের বিপক্ষে হলে বুখারী মুসলিমে বর্ণিত সহীহ হাদীসকেও পরিত্যাগ করা হচ্ছে। এ ধরনের খামখেয়ালী নাফসের অনুসরণ বলেই গণ্য কখনও তা রবের শরীয়ত হতে পারে না।

আর যদি কেউ বলে, সুন্নাহ বা হাদীসে প্রমাণিত বিধানগুলো মূলতো আল্লাহর পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ তাহলে কুরআন বিরোধী হওয়া বা না হওয়াকে শর্ত করা হচ্ছে কেনো?

আল্লাহর বিধানের সাথে আল্লাহর বিধানের কি কোনো বিরোধ হতে পারে! সত্য কথা হলো রসুলুল্লাহ ﷺ যেসব বিধি-বিধান দিয়েছেন সেগুলোই মূলত আল্লাহরই বিধান। আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার সবই কুরআনে লিপিবদ্ধ নেই। অনেক কথা আল্লাহর নির্দেশে জিব্রাইল (আঃ) রসুলুল্লাহ ﷺ কে শিখিয়ে দিয়েছেন। সেগুলো রসুলুল্লাহ ﷺ উম্মতকে শিখিয়ে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ তাকে এই দায়িত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেন, (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ) “তিনি আপনার উপর যিকির অবতীর্ণ করেছেন যাতে আপনি মানুষের উপর কি অবতীর্ণ হলো তা স্পষ্ট করে বলে দেন”। [নাহল/৪৪] কুরআনের বাইরেও যে ওহী হতো সে বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ হলো পবিত্র কুরআনেরই একটি আয়াত যেখানে বলা হয়েছে,

وَإِذْ أَسْرَ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ

রসুলুল্লাহ ﷺ তার এক স্ত্রীর নিকট কিছু কথা গোপন রাখেন কিন্তু ঐ স্ত্রী তা অন্যের নিকট প্রকাশ করে দেয়। পরে মহান আল্লাহ তার নবীকে এ ব্যাপারে অবহিত করেন। তখন নবী তার কিছু অংশ স্ত্রীকে শোনায় আর কিছু অংশ এড়িয়ে যান। অতঃপর যখন তিনি স্ত্রীকে এটা শোনান তখন ঐ স্ত্রী বলে কে আপনাকে অবহিত করলো? তিনি বলেন, আমাকে অবহিত করলো সর্বজ্ঞ ও সুবিজ্ঞ। [তাহরীম/৩]

এই আয়াতে বলা হচ্ছে ঐ খবরটি মহান আল্লাহই রসুলুল্লাহ ﷺ কে অবহিত করেন। কিন্তু পবিত্র কুরআনের কোথাও খবরটি উল্লেখ নেই। এ থেকে প্রমাণিত হয় মহান আল্লাহ তার রসুলকে গোপনে অনেক বিষয়ে অবহিত করতেন যা কুরআনে আসেনি। তারই উপর ভিত্তি করে রসুলুল্লাহ ﷺ পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন বিধানের ব্যাখ্যা প্রদান করতেন। অতএব কুরআনের সাথে হাদীসের কোনো বিরোধ হতে পারে না। তাই কুরআন বিরোধী হাদীস মানা যাবে না এমন বিভ্রান্তিমূলক কথার কোনো যৌক্তিকতা নেই।

## - কুরআনের সাথে হাদীসের বিরোধ মনে হলে করণীয়

অনেকে বলতে পারেন তাহলে কুরআনের সাথে হাদীসের যেসব বিরোধ বাস্তবে দেখা যায় তার বিধান কি? এর উত্তর হলো, আসলে এটা বিরোধ নয় কিছু ভুল বোঝাবুঝি মাত্র। কেবল কুরআনের সাথে হাদীসের নয়। কুরআনের আয়াতের সাথে কুরআনের আয়াতেরও অনুরূপ বিরোধ মনে হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ,

ক) মহান আল্লাহ তার রসুলকে ঘোষণা করতে বলেন, (وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ) “আমি প্রথম মুসলিম” [আনয়াম/১৬৩] এছাড়া বিভিন্ন আয়াতে রসুলুল্লাহ ﷺ কে প্রথম মুসলিম হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অথচ অন্য আয়াতে বলা হয়েছে,

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

ইব্রাহীম ﷺ তো ইয়াহুদী বা খৃষ্টান ছিলেন না বরং তাওহীদবাদী মুসলিম ছিলেন। আর তিনি মুশরিকও ছিলেন না। [আলে ইমরান/৬৭]

অন্য আয়াতে এসেছে ইয়াকুব ﷺ এর সন্তানরা বলেছিলো, (وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ) “আমার আল্লাহর উদ্দেশ্যে মুসলিম হয়েছি” [বাকদ্বারা/১৩৩] ঈসা ﷺ এর সাহাবী তথা হাওয়ারীগণ বলেছিলো, (وَأَشْهَدُ بِأَنَّ مُسْلِمُونَ) “আপনি সাক্ষ্য থাকুন যে আমরা মুসলিম”। [আলে-ইমরান/৫২]

এখন জানা কথা যে ইব্রাহীম ﷺ, ইয়াকুব ﷺ এবং ঈসা ﷺ এর যুগ ছিলো রসুলুল্লাহ ﷺ এর যুগের পূর্বে। তাহলে আগের আয়াতে সে রসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমিই প্রথম মুসলিম সেটা এর সাথে বিরোধী হয়ে গেলো না? এখন কোরেশি সাহেব কি করবেন? কোনো একটি আয়াতকে বাতিল ঘোষণা করবেন নাকি উভয়ের মধ্যে যে কোনোভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবেন। বলা বাহুল্য যে, কোনো একটি আয়াতকে বাতিল ঘোষণা করলে তিনি নিজেই কাফিরে পরিণত হবেন। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন,

أَفْتَوْمُنُونِ بَعْضُ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ

তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশ স্বীকার করো আর কিছু অংশ অস্বীকার করো। যে এটা করে তার শাস্তি এ ছাড়া আর কি হতে পারে যে দুনিয়ার জীবনে তাকে লাঞ্চিত করা হবে আর কিয়ামতের দিন তাকে কঠিন শাস্তির দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

[বাকারা/৮৫]

তাহলে কোনো একটি আয়াতকে বাতিল মনে করার সুযোগ নেই বরং উভয় আয়াতের মধ্যে যে কোনোভাবে সমন্বয় সাধন করতে হবে। এখানে সমন্বয় সাধনের সহজ পন্থা হলো আম-খাস সম্পর্কিত জ্ঞান। আমরা বলতে পারি প্রথম আয়াতে আমভাবে বলা হয়েছে রসুলুল্লাহ ﷺ প্রথম মুসলিম। আসলে উদ্দেশ্য হলো, তার যুগে তিনি প্রথম মুসলিম। এমন আম-খাস আমরা প্রায়ই ব্যবহার করি। অনেক সময় বলি অমুক ব্যক্তি সবচেয়ে জ্ঞানী বা সবচেয়ে ভাল। অনেক বোকা লোক এখানে আপত্তি করে বলতে

পারে সেকি আল্লাহ বা তার রসুলের চেয়েও বেশি জ্ঞানী বা বেশি ভাল। সাধারণ বুদ্ধির যে কেউ বুঝবে যে সে এটা বলতে চাইনি। আসলে সাধারণ মানুষের মধ্যে বা উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সে সর্বাধিক জ্ঞানী বা বেশি ভাল এটাই তার উদ্দেশ্য ছিলো। এটাকেই বলা হয় আম-খাস বুঝে কথা বলা। পবিত্র কুরআনেও বহু স্থানে এভাবে বলা হয়েছে। যেমন জাদুকরদের সাথে প্রতিযোগিতার সময় মুসা عليه السلام কে অভয় দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, (لَا تُخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى) “আপনি ভয় পাবেন না। আপনিই সর্বাধিক সম্মানিত”। [তাহা/৬৮] এখানে মুসা عليه السلام কে আল-আ’লা (الأعلى) তথা সর্বাধিক সম্মানিত হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অথচ আমরা জানি মহান আল্লাহর একটি নাম হলো আল-আ’লা (الأعلى) তথা সর্বাধিক সম্মানিত। যেমন আয়াতে বলা হয়েছে, (سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ) (الأعلى) “আপনার রবের তাসবীহ করুন যিনি আল-আ’লা তথা সর্বাধিক সম্মানিত।” [সূরা আল-আ’লা/১] এখন বলুন সর্বাধিক সম্মানিত কে? মুসা عليه السلام নাকি মহান আল্লাহ? নিশ্চয় মহান আল্লাহই সর্বাধিক সম্মানিত। তাহলে প্রথম আয়াতে মুসা عليه السلام কে সর্বাধিক সম্মানিত কেনো বলা হয়েছে? বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই বুঝতে পারবেন আসলে ঐ আয়াতে আমভাবে মুসা عليه السلام সকলের চেয়ে এমনকি আল্লাহর চেয়ে বেশি সম্মানিত [নাউযু বিল্লাহ] এটা উদ্দেশ্য নয় বরং জাদুকরদের তুলনায় তিনি অধিক সম্মানিত এটা বোঝানো হয়েছে। যে আয়াতে রসুলুল্লাহ ﷺ কে প্রথম মুসলিম বলা হয়েছে সেখানেও এমন অর্থই উদ্দেশ্যে অর্থাৎ তার যুগের অন্যান্য ব্যক্তিদের তুলনায় তিনিই প্রথম মুসলিম।

খ) অনুরূপ আরেকটি আয়াত হলো, মুসা عليه السلام বলেন, (وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ) “আমি প্রথম মুমিন” [আরাফ/১৪৩] অন্য আয়াতে এসেছে জাদুকররা মুসা عليه السلام এর নিকট হেরে গিয়ে তওবা করে মুসলিম হলো এবং বলল, (كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ) “আমরা প্রথম মুমিন”। [শোয়ারা/৫১] কম জানা লোকদের মনে হতে পারে এখানে উভয় আয়াতের মধ্যে বিরোধ ঘটছে অথবা জাদুকররা মিথ্যা কথা বলছে। আসলে ব্যাপার তা নয়। বরং আসল কথা হলো, জাদুকররা নিজেদের প্রথম মুমিন দাবী করছে মুসা عليه السلام কে ধরে নয় বরং মুসা عليه السلام ও তার সম্প্রদায়ের বাইরের লোকদের মধ্যে তারাই প্রথম মুমিন এই হিসেবে।

গ) উপরে আমরা আম-খাস না বোঝার কারণে দুটি আয়াতের মাঝে বিরোধ মনে হওয়ার উদাহরণ পেশ করেছি। এখন দেখবো হাক্কীকত-মাজাঝ তথা প্রকৃত অর্থ ও রূপক অর্থ না বোঝার কারণেও এমন বিরোধ মনে হতে পারে। মহান আল্লাহ বলেন, (إِنْ أُمِّتُّهُمْ إِلَّا الْإِنْسِي وَلَئِنْهُمْ) “তাদের জননী কেবল তারাই যারা তাদের জন্ম দিয়েছে”



[মুজাদালা/২] অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, (وَأَرْزَاؤُهُ أَتُحَدِّثُهُمْ) “নবীর স্ত্রীরা তাদের জননী”। [আহযাব/৬] এখানে দেখা যাচ্ছে প্রথম আয়াতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, যে জন্ম দেয় কেবল সেই জননী হতে পারে। কিন্তু পরের আয়াতে বলা হচ্ছে নবীর স্ত্রীরা মুমিনদের জননী। অথচ জানা কথা যে নবীর স্ত্রীরা তাদের জন্ম দেয়নি। অনেকে ভাবতে পারেন বিষয়টি পরস্পরবিরোধী হয়ে যায়। আসলে তা নয়। বরং প্রথম আয়াতে হাক্কীকত তথা প্রকৃত অর্থে জননী উদ্দেশ্য আর জানা কথা যে জন্ম না দিলে কেউ প্রকৃত অর্থে জননী হিসেবে গণ্য হয় না। আর দ্বিতীয় আয়াতে মাজাঝ (مَجَاز) তথা রূপক অর্থে বা সম্মান বোঝানোর জন্য জননী শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। যেভাবে বীরকে সিংহ বলা হয় আর বোকা মানুষকে গরু বলা হয়। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, বোকা মানুষকে জবাই করে তার মাংস খাওয়া বৈধ।

এভাবে চিন্তা করলে উভয় আয়াতে কোনো বৈপরীত্য আছে বলে মনেই হবে না। বুদ্ধিমান লোকেরা এভাবে চিন্তা করে তাই কোনো আয়াত বা হাদীসের মধ্যে তারা কোনো বিরোধ খুঁজে পায় না। কিন্তু বোকা লোকেরা আম-খাস, হাক্কীকত-মাজাঝ ইত্যাদি কোনো ব্যাপারেই কোনো জ্ঞান রাখে না। তাই একটু বুঝতে সমস্যা হলেই কুরান-হাদীসের যেখানে সেখানে বিরোধ আছে মনে করে গভোগোল পাকিয়ে ফেলে। হয়তো কোনো আয়াতকেই অস্বীকার করে বসে বা কোনো হাদীসকে বাতিল ঘোষণা করে।

ঘ) পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতে বলা হয়েছে, (فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ) “সেদিন কোনো মানুষ বা জিনকে তার কৃতকর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না” [রহমান/৩৯] অথচ অন্য আয়াতে এসেছে, (وَلْتَسْأَلْ عَنَّا كُتُوبٌ تَعْمَلُونَ) “তোমরা যা আমল করতে সে সম্পর্কে অবশ্যই তোমাদের প্রশ্ন করা হবে” [নাহল/৯৩] বাহ্যিকভাবে এখানে বিরোধ ঘটছে বলে মনে হয়। কিন্তু আসলে প্রথম আয়াতে প্রশ্ন করা হবে না বলতে উদ্দেশ্য হলো, কারো পাপ প্রমাণ করার জন্য তাকে প্রশ্ন করার কোনো প্রয়োজন পড়বে না। যেহেতু আল্লাহর নিকট সব কৃতকর্মের রেকর্ড রয়েছে। তাছাড়া তাদের হাত-পা আপনা-আপনিই সব কৃত কর্মের সাক্ষ্য প্রদান করবে। অতএব অপরাধ প্রমাণ করে বিচার করার জন্য তাদের নিকট প্রশ্ন করার দরকার পড়বে না। তবে বিচারের পর অতিরিক্ত অপমান করার জন্য তাদের প্রশ্ন করা হবে। সূরা সফফাত ২৪ ও ২৫ নং আয়াত পাঠ করলে এই ব্যাখ্যা অনুধাবন করা যায়। সেখানে বলা হয়েছে, কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ প্রথমেই কাফির-মুশরিকদের হাজির করার নির্দেশ দিয়ে বলবেন, (فَأَهْذَوْهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ) “তাদের জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাও” অর্থাৎ কোনোরূপ প্রশ্ন

না করেই তাদের বিচার হয়ে যাবে এর পর বলবেন, (وَقَفُّوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْتُولُونَ) “একটু দাড়া করাও ওদের কটা প্রশ্ন করে নিই”।

ঙ) একটি আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, (يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلِّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ) “সেদিন কেউ আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কথা বলবে না” [১০৫] অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, (وَلَا يُؤْذَنُ) “তাদের ওয়র পেশ করার অনুমতি দেওয়া হবে না” [মুরসালাত/৩৬] এখানে বলা হয়েছে অনুমতি ছাড়া কেউ কথা বলবে না আর ওয়র আপত্তি পেশ করার অনুমতি দেওয়া হবে না এ থেকে বোঝা যায় সেদিন কেউ ওজর আপত্তি পেশ করবে না। অথচ অন্য আয়াতে আল্লাহ কিয়ামতের দিনে মানুষের অবস্থা সম্পর্কে বলেন, (وَلَوْ) “যদিও সে ওজর পেশ করবে”। [কিয়ামা/১৫] প্রশ্ন হলো যদি অনুমতি ছাড়া কেউ কথা বলতে না পারে আর যদি ওজর পেশ করার অনুমতি দেওয়া নাই হয় তবে কিভাবে তারা ওজর পেশ করবে? অনেকের নিকট এটাও পরস্পরবিরোধী মনে হবে। আসলে এখানে আমভাবে ওজর পেশ করতে পারবে না এমন বলা হলেও আসলে উদ্দেশ্য হলো, গ্রহনযোগ্য কোনো ওজর পেশ করতে পারবে না। অর্থাৎ ওজর আপত্তি সেদিন কোনো কাজে আসবে না। যেমন অন্য আয়াতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, (فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ) “সেদিন পাপীদের কোনো ওজর তাদের কাজে আসবে না।” [রুম/৫৭]

চ) একটি আয়াতে বলা হয়েছে (فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ) “মুসা ﷺ লাঠি ছুড়ে দিলে তা স্পষ্ট অজগরে পরিণত হলো” [আ’রাফ/১০৭] অন্য আয়াতে লাঠি ছুড়ে দেওয়ার পর যে সাপ দেখা গিয়েছিলো তার সম্পর্কে বলা হয়েছে (كَانَ أَهْلًا جَانًّا) যেহেতু তা দ্রুত ছুটতে পারে এমন সাপ” [কসাস/৩১] এখানে বলা হচ্ছে দ্রুত ছুটতে পারে এমন সাপের কথা অথচ আগের আয়াতে বলা হয়েছে তা ছিলো অজগর সাপ। আর জানা কথা যে অজগর সাপ দ্রুত ছুটতে পারে না। এর ব্যাখ্যা হলো তা আসলে অজগরের মতোই বড় সাপ ছিলো কিন্তু ছুটার সময় ছোট সাপের মতোই জোরে ছুটতো।

ছ) একটি আয়াতে এসেছে মহান রব্বুল আলামীন বলেন, (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ) “তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে কেবল মৃত জন্তু, রক্ত, শুকরের মাংস এবং গয়রুহ্লাহর উদ্দেশ্যে জবেহ করা জন্তু। [বাকারা/১৮৩] এখানে বলা হয়েছে কেবল এই চারটি জিনিস পানাহার করা হারাম অথচ অন্য আয়াতে মদকে হারাম করে বলা হয়েছে, (وَجَسَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ) “তা নাপাক ও শয়তানী কাজ

অতএব তা পরিত্যাগ করো” [মায়দা/৯০] এই আয়াতের মাধ্যমে মদ পান করা হারাম করা হয়েছে। অথচ আগের আয়াতে বলা হয়েছে কেবল চারটি জিনিস হারাম। তার মধ্যে মদ নেই। অনেকের নিকট মনে হবে এটা পরস্পরবিরোধী। আসলে এখানেও আম-খাসের ব্যাপার। উপরের আয়াতে উদাহরণ হিসেবে খাসভাবে কয়েকটা জিনিসের নাম করা হয়েছে কিন্তু আসলে উদ্দেশ্য হলো ঐ প্রকৃতির কিছু জিনিস হারাম আছে যা অন্যান্য আয়াত বা হাদীসে পাওয়া যাবে। সেগুলোই পরিত্যাগ করে চলতে হবে। যেমন একটি আয়াতে বলা হয়েছে, (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا) “তাদের তো কেবলই এক ইলাহকে ইবাদত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো” [তাওবা/৩১] এখানে কেবল ইবাদত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো এমন কথা বলা হয়েছে নামাজ বা যাকাতের কথা বলা হয়নি। এখানে যেহেতু আমভাবে ইবাদত করার কথা বলা হচ্ছে নামাজ বা যাকাতের কথা নির্দিষ্টভাবে বলা হয়নি। অতএব, যেকোনো ইবাদত করাই যথেষ্ট এমন মনে হয়। কিন্তু অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ) (وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ) “তাদের তো নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো একনিষ্ঠভাবে এক আল্লাহর ইবাদত করার জন্য এবং নামাজ কায়েম ও যাকাত আদায়ের জন্য। এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত ধীন। [বায়্যিনাহ/৫] এখানে প্রথম আয়াতে কেবল এক আল্লাহর ইবাদত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এমন বলা হলেও তার উদ্দেশ্য এই নয় যে কেবল ইবাদত করলেই হয়ে যাবে নামাজ বা যাকাত আদায় করার প্রয়োজন নেই। বরং আসল কথা হলো প্রথম আয়াতে সংক্ষেপে আর পরের আয়াতে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। অতএব এখানে একটি আয়াতকে অন্যটির বিপরীত ও বিরোধী মনে করে গন্ডগোল সৃষ্টি না করে একটিকে অন্যটির ব্যাখ্যা হিসেবে গ্রহণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। একইভাবে কুরআনের সাথে হাদীসের এমন বিরোধ মনে হলেও তাকে উপরোক্ত পন্থায়ই সমাধান করতে হবে। যেহেতু আল্লাহ ও তার রসুলের কথার মাঝে প্রকৃতই কোনো বিরোধ থাকতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, মহান আল্লাহ আমভাবে যাকাত প্রদান করতে বলেছেন, আর হাদীসে আড়াই পারসেন্ট, নিসাব, বছর গননা ইত্যাদি বিষয়ের কথা উল্লেখিত আছে। এখন এসব হাদীসকে যাকাতের আয়াতের বিরোধী মনে না করে যাকাতের আয়াতের ব্যাখ্যা হিসেবেই গণ্য করতে হবে। এটাই হবে সঠিক পন্থা যা উপরোক্ত আলোচনার আলোকে প্রমাণিত হয়েছে।

এরপরও যারা এই পন্থা গ্রহণ করতে চায় না বরং কুরআন বিরোধী হওয়ার দাবী করে যাকাতের নিসাব ও বছর সম্পর্কিত হাদীসগুলো পরিত্যাগ করতে চায় বা বেত্রাঘাতের

আয়াতের সাথে বিরোধী মনে করে রজমের হাদীসকে পরিত্যাগ করতে চায় তাদের উদ্দেশ্যে আমাদের প্রশ্ন হলো,

মহান আল্লাহ বলেছেন, (أَقِمُوا الصَّلَاةَ) “সলাত কায়েম করো” [বাকারা/৪৩] অন্য আয়াতে মেয়েদের প্রতি বিশেষভাবে বলা হয়েছে, (وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ) “তোমরা সলাত কায়েম করো”। [আহযাব/২৩] এখানে আমভাবে সকল মেয়েকে সলাত আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু হাদীসে বলা হয়েছে, (فَإِذَا أَقْبَلْتَ حَيْضُكَ فَذَعِي الصَّلَاةَ) “যখন তোমার হায়েজ হয় তখন সলাত পরিত্যাগ করো” [বুখারী] কুরআনের কোথাও কিন্তু হায়েজ অবস্থায় সলাত আদায় করা যাবে না এ কথা বলা নেই। বড় জোর জুনুবী অবস্থায় গোসল না করে সলাত আদায় করতে নিষেধ করা হয়েছে। জুনুবী অবস্থা অর্থ হলো, স্ত্রী সহবাস জনিত কারণে গোসল ফরজ থাকা। তাছাড়া আমভাবে সলাত আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখন উপরোক্ত আম নির্দেশের সাথে বিপরীত হওয়ার কারণে এই হাদীসকে পরিত্যাগ করে হায়েজ অবস্থায় সলাত চালিয়ে যাওয়ার ফতোয়া দেওয়া কি সঠিক হতে পারে! আর যদি বলা হয়, এক্ষেত্রে এই হাদীসকে মেনে চলতে হবে। তাহলে প্রশ্ন দেখা দেয়, ইচ্ছামতো যে কোনো হাদীসকে মানা বা না মানার এই উদ্ভটনীতি কি হক পথ হিসেবে গণ্য হতে পারে! এমন দ্বিমুখিতা তো কেবল নিফাকী হিসেবেই গণ্য হতে পারে। এধরণের আরো অনেক দ্বিমুখী আচরণ কোরেশী সাহেব এবং তার অনুসারীরা করে থাকেন যার কিছু বর্ণনা নিচে দেওয়া হলো।

ক) পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন, (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) “তোমাদের উপর মৃতকে হারাম করা হয়েছে” [মায়দা/৩] এই আয়াতে আমভাবে সকল মৃতকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। এ অনুযায়ী মরা মাছও হারাম হওয়া উচিত। অথচ কোরেশী সাহেব বলেছেন, “কিন্তু মরা মাছ হালাল”। [খাদ্য সম্পর্কে বিধি নিষেধ পৃষ্ঠা-৩] প্রশ্ন হলো, উপরোক্ত আয়াতের বিরুদ্ধে তিনি কেনো ফতোয়া দিলেন? অথচ তিনি নিজেই বলেছেন, “আল্লাহর আয়াত বিরোধী কোনো হাদিস বা নবীর কথাও মান্য করা নিষিদ্ধ। কিয়াস, ইজমা ও ফতোয়া তো অনেক দূরের কথা”। [ফারুকী ফিতনার জবাব ২৩ পৃষ্ঠা] এখন আল্লাহ বললেন, মৃত হারাম আর ফারুক কোরেশী ফতোয়া দিচ্ছেন মরা মাছ হালাল। তার অনুসারীদের নিকট প্রশ্ন হলো, কোরেশী সাহেবের এই কুরআন বিরোধী ফতোয়া কি আপনারা মেনে চলবেন? বলা বাহুল্য যে, আমাদের এখানে কোনো সমস্যা নেই। কারণ আমরা মরা মাছ হালাল মনে করি। যেহেতু ইবনে মাযা বর্ণিত একটি হাদীসে মরা মাছ বৈধ হওয়ার প্রমাণ আছে। আমাদের মতে কুরআন-হাদীসের মাঝে বিরোধ

মনে হলে আম-খাসের মাধ্যমে তা সমাধান করতে হয়। অতএব আমরা বলবো, আয়াতে আমভাবে মৃতকে হারাম বলা হলেও হাদীসের মাধ্যমে মাছের বিষয়টি খাস হয়ে গেছে। কিন্তু কোরেশী সাহেবের মতে তো কুরআন বিরোধী হওয়ার কারণে হাদিসটি বাতিল হয়ে যাবে। তাহলে আল্লাহর কিতাবের বাইরে গিয়ে মরা মাছকে হালাল বলার সাহস তিনি কোথায় পেলেন?

খ) আল্লাহ প্রদত্ত অর্থনীতি নামক গ্রন্থে কোরেশী সাহেব কানয (كنز) তথা পুঞ্জিভূত টাকা-পয়সা বা ধনসম্পদ সম্পর্কে বলেন, “বছরান্তে ঐ মালের চল্লিশ ভাগের একভাগ যাকত স্বরূপ প্রদান করিতে হইবে” [পৃষ্ঠা/৩১] এই ফতোয়াটি তিনি একটি হাদীস থেকে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, হাদীসে এসেছে,

فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَّةِ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ، فَفِيهَا خُمْسُهُ دِرْهَمٍ

তোমরা রোপার সদকা প্রদান করো। প্রতি চল্লিশ দিরহামে এক দিরহাম আর এক শত নিরানব্বই দিরহামেও কিছু দিতে হবে না। যখন দুই শত দিরহাম হবে তখন পাঁচ দিরহাম দিতে হবে। [আবু দাউদ]

এই হাদীসের প্রকৃত অনুবাদ এই। কোরেশী সাহেব অবশ্য নিজের মতবাদ প্রমাণ করার জন্য হাদীসের মধ্যে ডান হাত, বাম হাত চালিয়েছেন। তিনি হাদীসের অনুবাদ করেছেন এমন,

“তোমরা রোপের (উপার্জিত টাকা পয়সার) সদকা (যাকাত) প্রদান করিও প্রত্যেক চল্লিশ দেরহামে এক দেরহাম (চল্লিশ টাকায় এক টাকা) এবং (গচ্ছিত রোপ্য বা টাকা পয়সায়) এক শত নব্বই এ (যাকাত) নাই কিন্তু (গচ্ছিত) রোপ্য (টাকা পয়সা) দুই শত দেরহামে পৌঁছিলে তখন উহাতে পাঁচ দেরহাম (দিতে হবে)।” [উক্ত গ্রন্থ পৃষ্ঠা ৪৫]

পাঠক লক্ষ্য করুন, যিনি কুরআন বিরোধী হাদীস মানবেন না আর কুরআন-হাদীস বিরোধী কোনো ফতোয়া মানবেন না। তিনি নিজের মত প্রমাণ করার জন্য হাদীসটির স্থানে স্থানে এতটা তালি-পট্টি দিলে তা কিভাবে মেনে নেওয়া যায়! নিজের মনমতো একই হাদীসের কোথাও উপার্জিত সম্পদ আবার কোথাও গচ্ছিত সম্পদ যোগ করার স্পর্ধা তার কিভাবে হয়? অন্য কোনো আয়াত বা হাদীসে কি এর স্বপক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়! সে প্রমাণ তো তিনি দিতে পারেননি। তাহলে কোনো প্রমাণ ছাড়াই এটা করা কি হাদীসের মধ্যে দাদাগিরি করা বলে গণ্য নয়? কোরেশী সাহেবের অনুসারীরা যদি এটাকে ব্যাখ্যা হিসেবেও চালাতে চায় তবে প্রশ্ন হলো হাদীসের ব্যাখ্যা করার অধিকার

কি কেবল ফারুক কোরেশীর আছে অন্য কোনো আলেমের নেই? যাই হোক, নিসাব সম্পর্কিত আলোচনায় এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। এখানে আমরা তর্কের খাতিরে কোরেশী সাহেবের অনুবাদই মেনে নিচ্ছি। ধরে নিলাম, হাদীসে বলা হয়েছে, গচ্ছিত সম্পদে দুই শত দিরহামের নিচে যাকাত নেই এবং গচ্ছিত সম্পদে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে বলা হয়েছে। অতএব, কেউ যদি দুই শত দিরহামের নিচে কিছু জমা রাখে তার কিছুই প্রদান করতে হবে না আর যদি তার বেশি হয় তবে জমাকৃত সম্পূর্ণ সম্পদ নয় বরং কেবল চল্লিশ ভাগের এক ভাগ প্রদান করতে হবে। উপরোক্ত হাদীস থেকে কোরেশী সাহেব এটাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন। প্রশ্ন হলো, হাদীসের অর্থ যদি এটাই হয় তবু তা গ্রহণ করা কি কোরেশী সাহেবের জন্য ঠিক হয়েছে? যেহেতু তার মূলনীতি হলো, কুরআন বিরোধী হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি স্পষ্ট বলেছেন, “আল্লাহর আয়াত বিরোধী কোন হাদিস বা নবীর কথাও মান্য করা নিষিদ্ধ”। [জবাব- ২৩ পৃষ্ঠা] এখন কানয সম্পর্কিত আয়াতে মহান আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে বলেন, (وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُفْقِدُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِئْسَ لَهُم بَعْدًا أَبَيمٌ) “যারা সোনা-রোপা পুঞ্জিভূত করে রাখে এবং তা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে না তাদের যন্ত্রনাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও” [তাওবা/৩৫] লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো মহান আল্লাহ আমভাবে সম্পদ পুঞ্জিভূত করা তথা জমা করা এবং আমভাবে পুঞ্জিভূত সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় না করলে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তির কথা বলেছেন। এখানে কম বেশি যাই জমা থাক তা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার কথা বলা হচ্ছে। এমনকি এখানে মিন (من) শব্দটিও উল্লেখ নেই যা থেকে ‘কিছু অংশ’ অর্থ নেওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ ‘তা থেকে ব্যয় করে না’ এমন বলা হয়নি বরং ‘তা ব্যয় করে না’ এমন বলা হয়েছে। এ হিসেবে যা কিছু পুঞ্জিভূত আছে তার সবই দান করা আবশ্যিক প্রমাণিত হয়। এটাই আয়াতের আম দাবী। এখন আম-খাস না মানলে কোরেশী সাহেবের উল্লেখিত হাদীসটি এই আয়াতের বিরোধী প্রমাণিত হয় ফলে তা বাতিল হয়ে যায়। অথচ কোরেশী সাহেব এখানে আয়াতের আম বক্তব্যকে পরিত্যাগ করে হাদীসটিকে গ্রহণ করেছেন। নিজের পক্ষে গেলে তিনি এমন ডিগবাজি প্রায়ই খেয়ে থাকেন।

এমন দ্বিমুখীতার উদাহরণ আরও অনেক রয়েছে যা এখানে সুবিস্তারে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। এখানে কেবল এতটুকু স্মরণ রাখাই যথেষ্ট যে, “কুরান বিরোধী হাদীস মানা যাবে না” এই মতবাদ কুরআন-হাদীস ও নিরোপেক্ষ বিচারবুদ্ধির আলোকে সুস্পষ্ট ভ্রান্তি হিসেবে চিহ্নিত। কোরেশী সাহেব নিজেও সব জায়গায় এই মূলনীতি অনুসরণ করেননি। যেমনটি আমরা উপরে দেখেছি। বোঝায় যায়, খেয়াল খুশি মতো যে কোনো

হাদীসকে গ্রহণ আর যে কোনো হাদীসকে বর্জন করার মতো খামখেয়ালী করার উদ্দেশ্যেই তিনি এমন বেদাতী মতবাদের জন্ম দিয়েছেন।

## ২ নং বিভ্রান্তিঃ- শব্দ নিয়ে খেলা

বেদাতীদের দ্বিতীয় অস্ত্র হলো শব্দ নিয়ে খেলা করা। কুরআন-হাদীসের শব্দগুলোর ভুল ব্যাখ্যা করেই তারা মানুষকে পথভ্রষ্ট করে থাকে। পবিত্র কুরআনে এমন কিছু শব্দ আছে যার একাধিক অর্থ আছে। আবার অনেক শব্দ তার প্রকৃত অর্থের পরিবর্তে রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বত্র চিন্তাভাবনার লোকেরা এসব শব্দগুলোকে যথাস্থানে প্রয়োগ না করে ভুল স্থানে প্রয়োগ করে থাকে। এদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, (يُحَرِّفُونَ) (الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ) “তারা শব্দ সমূহ যথাস্থান থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়।” [নিসা/৪৬] ফারুকী ফিতনার জবাবে কোরেশী সাহেব নিজেই “কুরআন হাদীস গোপন করা বা রদ-বদল করার বিরুদ্ধে” কথা বলেছেন। [১১ পৃষ্ঠা] তা দেখে সহজ সরল পাঠক হয়তো ধারণা করতে পারে তাহলে তিনি নিজে বোধ হয় কোনো হাদীস গোপন করেননি বা কুরআন-হাদীসে কোনো রদ-বদলও করেননি। তার লেখা মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলেই এই ভুল ভেঙে যাবে। দেখা যাবে তিনি নিসাব সম্পর্কিত বেশ কিছু হাদীস গোপন করেছেন এবং বেশ কিছু আয়াত হাদীসের অর্থের মধ্যে রদ-বদল করেছেন। নিচে এ বিষয়ে কিছু উদাহরণ পেশ করা হলো,

ক) একটি আয়াতে এসেছে, (وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ) “তারা বলে কতটুকু ব্যয় করবো? আপনি বলুন স্বচ্ছল অবস্থায়”। [বাকারা/২১৯] কোরেশী সাহেব এই আয়াতের খুব হাস্যকর একটা অনুবাদ করেছেন। তিনি লিখেছেন, “তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে কি পরিমাণ খরচ করিবে? তুমি বল, ক্ষমার (অভাবীর অভাব পূরণ) যোগ্য” লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, আয়াতের আফওয়া (عفو) শব্দের অর্থ তিনি করেছেন ‘ক্ষমার যোগ্য’। পরে তার মধ্যে আবার নিজের মন মতো ‘অভাবীর অভাব পূরণ’ কথাটি ঢুকিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি বোঝাতে চাচ্ছেন মূল আয়াতের অনুবাদ হলো, যতটুকু ক্ষমার যোগ্য ততটুকু ব্যয় করো। আর এর ব্যাখ্যা হলো, অভাবীর অভাব যতটুকুতে পূরণ হয় ততটুকু ব্যয় করো। এমন অর্থ করার কারণ হলো, আফওয়া (عفو) শব্দটির একটি অর্থ হলো, ক্ষমা করা। লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হলো, আফওয়া শব্দটির আরও একটি অর্থ রয়েছে তা হলো, স্বচ্ছলতা। মহান আল্লাহ অন্য আয়াতে যারা রসুলদের অমান্য করে তাদের সম্পর্কে বলেন,

ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضُّرُّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً

পরে আমি তাদের দুঃখ কষ্টের বদলে নেয়ামত দান করি। এমনকি যখন তারা স্বচ্ছল হয়ে যায় এবং বলে, আমাদের পূর্বপুরুষরা কত দুঃখ কষ্ট করেছে তখন হঠাৎ আমি তাদের পাকড়াও করি। [আ'রাফ/৯৫]

এই আয়াতে আফাও (عفا) শব্দই উল্লেখিত আছে। কিন্তু এখানে ক্ষমা অর্থ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। যেহেতু ক্ষমা হলে শাস্তি আসতে পারে না। বরং এখানে অর্থ হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে নেয়ামত আসার কারণে স্বচ্ছল হয়ে যাওয়া। খোদ কোরেশী সাহেবও তার অভিধানে এই আয়াতে “এমনকি তারা স্বচ্ছলতা লাভ করিয়াছিল” এই অনুবাদ করেছেন। [৫১৯ পৃষ্ঠা]

এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় আফওয়া (عفو) শব্দটি যেমন ক্ষমা অর্থে ব্যবহৃত হয় তেমনই স্বচ্ছলতা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখন প্রশ্ন হলো, উপরের আয়াতে কতটুকু ব্যয় করা হবে সে প্রশ্নের উত্তরে আফওয়া শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কোরেশী সাহেব এখানে ক্ষমা অর্থ গ্রহণ করেছেন। তিনি অনুবাদ করেছেন, তারা প্রশ্ন করে কতটুকু ব্যয় করবো বলুন, ক্ষমার যোগ্য। বুদ্ধিমান যে কোনো পাঠকের কাছে অনুবাদটি অবোধগম্য মনে হবে। ব্যয় করার সাথে ক্ষমার যোগ্য কথাটা পুরোপুরি অসঙ্গতিপূর্ণ মনে হবে। যেহেতু ক্ষমার প্রশ্ন আসে কোনো ভুল-ত্রুটি বা পাপ কাজ হয়ে গেলে। এখানে ব্যয় করা তো আর পাপের কাজ নয় তাহলে ক্ষমার যোগ্য কথাটি কেনো বলা হবে? কোরেশী সাহেবও এই অসঙ্গতি ধরতে পেরেছেন তাই নিজের পক্ষ থেকে ব্রাকেটে অভাবীর অভাব পূরণ কথাটি যোগ করেছেন। উপরে আমরা দেখেছি তিনি হাদীসের মধ্যেও এমন তালি-পট্টি লাগিয়েছেন। এখন দেখছি রবের আয়াতও তার আশ্রয় থেকে মুক্তি পায় নি। ক্ষমা থেকে অভাব আর সেখান থেকে অভাব পূরণের যে ব্যাখ্যা তিনি আমাদের শোনাচ্ছেন তা যে কতটা হাস্যকর অন্ধভক্তির চমশা খুলে অবলকন করলে যে কেউ টের পাবেন আসা করি। এক কথায় বলা যায় ব্যয়ের সাথে ক্ষমা অর্থটি একেবারেই খাপ খায় না। এখানে জোর করে তা খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করার কোনো প্রয়োজনও নেই। যেহেতু আফওয়া শব্দের আরও একটি অর্থ রয়েছে আর তা হলো, স্বচ্ছলতা লাভ করা। সামান্য চিন্তা করলেই বোঝা যাবে অর্থটি এখানে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ। যেহেতু ব্যয়ের বিষয় আসলেই স্বচ্ছলতা বা অস্বচ্ছলতার প্রশ্ন চলে আসে। আফওয়া শব্দটির দুটি অর্থের উপর সামান্য চিন্তা করলেই যে কোনো বুদ্ধিমান পাঠক বুঝে নিতে পারবেন যে কতটুকু ব্যয় করবো এই প্রশ্নের জবাবে ক্ষমার যোগ্য এই অর্থের বদলে স্বচ্ছল অবস্থায় এই অর্থটি নিঃসন্দেহে অধিক সঙ্গতিপূর্ণ হয়। এতদূর চিন্তা না করেই আফওয়া শব্দের দুটি



অর্থ আছে বলেই কোরেশী সাহেব বোকার মতো এই আয়াতে ক্ষমার যোগ্য অনুবাদ করেছেন। তার অবস্থা হয়েছে ঐ বাচ্চা ছেলের মতো যাকে কোনো বয়স্ক লোক প্রশ্ন করে,

- খোকা তুমি কিসে পড়ো?

ছেলেটা তৎক্ষণাৎ বলে ওঠে,

- বৃষ্টির সময় রাস্তায় পিছলে পড়ি।

পড়া বলতে কখনও বই পড়া আবার কখনও পিছলে পড়া উভয় অর্থ বোঝায় বলেই কিসে পড়ো এর উত্তরে রাস্তায় পিছলে পড়ি কথাটা কতটা হাস্যকর যে কোনো বুদ্ধিমান লোক তা বুঝতে পারবেন বলে আশা করি। আমাদের দেশের কোনো বাচ্চা ছেলেও সম্ভবত এমন বোকামী করে না। দুঃখজনক হলেও সত্য যে কোরেশী সাহেব এই আয়াতের অনুবাদে এমন বোকামীই করেছেন।

কিন্তু যোগ্য ওলামায়ে কেরামের কেউই আয়াতের এমন অর্থ করেননি। তারা এই আয়াতে আফওয়া বলতে স্বচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করাই বুঝেছেন। তাবারী, কুরতুবী, ইবনে কাছির ইত্যাদি সকল তাফসীরেও আয়াতের এই অর্থই করা হয়েছে। আমরা জানি কোরেশী সাহেব এসব তাফসীরে উল্লেখিত ব্যাখ্যাকে এক পয়সা মূল্য দেন না। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন হলো, তার নিজের ব্যাখ্যাকেই বা মানুষ কেনো গুরুত্ব দেবে? তাছাড়া রসুলের সাহাবী এবং চাচাতো ভাই ইবনে আব্বাস রা থেকেও এই আয়াতের এই ব্যাখ্যাই বর্ণিত আছে। তিনি এ আয়াতের আফওয়া এর ব্যাখ্যায় বলেন, (الْفَضْلُ عَلَى الْغِيَالِ) “পরিবারের লোকদের খরচ চালিয়ে যা অবশিষ্ট থাকে” [তাবারানী মু’জামে কাবীর] অর্থাৎ নিজ পরিবারকে স্বচ্ছল রেখেই দান করতে হবে। এর স্বপক্ষে রসুলুল্লাহ স থেকেও হাদীস রয়েছে, ধনীরা যাকাত দিয়ে সব সওয়াব হাসিল করে ফেলছে এমন দাবী করে একদল সাহাবায়ে কিরাম রসুলুল্লাহ স এর নিকট বলেন, (وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ) “এবং তারা অবশিষ্ট মাল থেকে সদকা করে”। [মুসলিম] অন্য হাদীসে এসেছে, রসুলুল্লাহ স বলেন, (إِنَّ خَيْرَ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِيًى) “সর্বোত্তম সদকা হলো তাই যা আদায় করার পরও কোনো ব্যক্তি ধনী থাকে”। [আবু দাউদ] অন্য হাদীসে এসেছে, (خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِيًى) “সর্বোত্তম সদকা হলো, ধনী অবস্থায় যা করা হয়। আর তুমি যাদের লালন-পালন করো তাদের দ্বারা শুরু করো”। [বুখারী ও মুসলিম] দেখা যাচ্ছে মহান রব্বুল আলামীন স্বচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করতে বলেছেন আর রসুলুল্লাহ স নিজেও প্রথমে

পরিবারের লোকদের উপর ব্যয় করতে বলেছেন এবং তাদের স্বচ্ছল অবস্থায় রেখে তাই দান করতে বলেছেন। এসব নীতি ভঙ্গ করে কোরেশী সাহেব বলেছেন, “উৎপাদিত ফসল বা অর্জিত ধন সম্পদ বা টাকা পয়সার সর্ব প্রথম যাকাত প্রদান করিয়া তারপর অন্যান্য হক আদায় করিতে হইবে” [আল্লাহ প্রদত্ত অর্থনীতি ২৮ পৃষ্ঠা] তাহলে রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, পরিবারের লোকদের হক সর্বপ্রথম আদায় করিতে হইবে আর কোরেশী সাহেব বলেছেন সর্বপ্রথম যাকাত দিতে হবে তার পর অন্যান্য হক আদায় করতে হবে। স্পষ্ট বোঝা যায় এটা একটা হাদীস বিরোধী ফতোয়া। কেবল হাদীস নয় এটা পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত আয়াতের বিরুদ্ধে যেখানে আফওয়া তথা স্বচ্ছল অবস্থায় দান করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। এখন প্রশ্ন হলো, কুরআন-হাদীস বিরোধী এই ফতোয়াকে মান্য করা কিভাবে বৈধ হতে পারে! তার চেয়েও বড় প্রশ্ন হলো, পবিত্র কুরআনের আয়াতের এমন অপব্যাক্ষা কিভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে!

খ) আল্লাহ প্রদত্ত অর্থনীতি নামক গ্রন্থের ২২ পৃষ্ঠায় কোরেশী সাহেব বলেন, “কুলি মজুররাও তাহাদের কঠোর পরিশ্রম দ্বারা অর্জিত পারিশ্রমিক হইতে যাকাত প্রদান করিত।” এরপর তিনি সূরা তাওবার ৭৯ নং আয়াতটি উল্লেখ করেন। সেখানে দিন আনে দিন খায় এমন কিছু মুমিন স্বেচ্ছাপ্রনোদিত হয়ে কিছু সদকা করেছিলো বলে মুনাফিকরা তাদের নিয়ে তামাশা করেছিলো এমন বলা হয়েছে। কোরেশী সাহেব আয়াতের অনুবাদে দুটি স্থানে তালি-পট্টি লাগিয়েছেন। **প্রথমতঃ** সদকার স্থানে ব্রাকেটে লিখেছেন (যাকাত)। অর্থাৎ তিনি বোঝাতে চেয়েছেন আয়াতটি ফরজ যাকাত সম্পর্কে। **দ্বিতীয়তঃ** তিনি মুত্তাওইয়ীন (مطوعين) তথা স্বেচ্ছাপ্রনোদিত হয়ে কথাটির অনুবাদে রদ বদল করেছেন। তিনি লিখেছেন ‘সদকা (যাকাত) প্রদানে অত্যানুরাগী’। [উক্ত গ্রন্থ/ ২২ পৃষ্ঠা] অর্থাৎ তিনি মুত্তাওইয়ীন (مطوعين) শব্দের অর্থ করেছেন, ‘অত্যানুরাগী’ বা ‘ভীষণভাবে আগ্রহী’। এটাও পবিত্র কুরআনের শব্দসমূহকে যথাস্থান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ। এটা জানা কথা যে, মুত্তাওইয়ীন (مطوعين) শব্দের অর্থ কোনোরূপ বাধ্যবাধকতা বা আবশ্যিকতা ছাড়াই স্বেচ্ছায় কিছু করা। কেবল এই অর্থের উপর লক্ষ্য রাখলেই এটা বুঝে নেওয়া সম্ভব যে এই আয়াতে গায়ে খাটা লোকদের যে সদকা প্রদানের কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে তাতে ফরজ সদকা তথা যাকাত নয় বরং নফল দান উদ্দেশ্য। অন্য হাদীসে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। একটি হাদীসে এসেছে রসুলুল্লাহ ﷺ একজন ব্যক্তিকে কতটুকু নামাজ, রোজা ও যাকাত ফরজ তা অবহিত করলে সে বলে এর চেয়ে বেশি কি আমার করতে হবে? উত্তরে তিনি বলেন, (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) “না, তবে তুমি স্বেচ্ছায় কিছু করলে করতে পারো” [বুখারী ও মুসলিম]

কোরেশী সাহেব নিজেও এই হাদীস উল্লেখ করেছেন এবং এর অনুবাদে বলেছেন, “না, তবে তুমি যদি স্বেচ্ছায় কিছু করো” [আল্লাহ প্রদত্ত অর্থনীতি ৩৮ পৃষ্ঠা] এখন আরবী ব্যাকরণ সম্পর্কে যার ধারণা আছে সে জানে যে হাদীসে ব্যবহৃত তাতাওওয়া (تَطَوُّع) শব্দের (ت) ও (ط) মিলিত হয়েই ইতাওওয়া (إِطَّوْع) এবং সেখান থেকে পরে ফায়েলের ওজনে মুত্তাওইয়ীন (مُطَوِّعِينَ) শব্দটি উদগত হয়েছে। অর্থাৎ আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী দুটি শব্দের অর্থই একই হতে হবে। যেমন মুত্তাহহিরীন (مُطَهَّرِينَ) আর মুত্তাহহিরীন (مُطَهَّرِينَ) বলতে একই বিষয়কে বোঝায়। তাহলে হাদীস অনুযায়ী আয়াতের অর্থ হবে দিনমজুররা ফরজ বা আবশ্যিকতা হিসেবে নয় বরং নফল হিসেবে স্বেচ্ছায় কিছু দান করতো। প্রখ্যাত তাফসীরকারক ইবনে জারীর আত-তাবারী এই অর্থই করেছেন তিনি বলেন, তারা স্বেচ্ছায় ঐ সম্পদ দান করতেন যা (بِمَا لَمْ يُوجِبْهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ) “দান করা মহান আল্লাহ তাদের উপর আবশ্যিক করেননি” [তাফসীরে তাবারী] দেখা যাচ্ছে ইবনে জারীর তাবারী আয়াতের ঐ অর্থই করেছেন যা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আর কোরেশী সাহেব গরীব মানুষের উপরও যাকাত দেওয়া ফরজ এই মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য সম্পূর্ণ মনগড়া একটা অর্থ বর্ণনা করেছেন। একেই বলে পবিত্র কুরআনের শব্দকে তার স্থান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া।

গ) একটি হাদীসে এসেছে, উটের ক্ষেত্রে পাঁচ যাওদের (خُمْسٍ دَوْدٍ) নিচে যাকাত নেই। এখানে যাওদ শব্দের অর্থের মধ্যে কিছুটা অস্পষ্টতা আছে। উপরে আমরা বলেছি ফেতনাবাজ লোকেরা অস্পষ্ট বিষয়ের সুযোগ গ্রহণ করতে ছাড়ে না। কোরেশী সাহেবও এখানে যাওদ শব্দের অস্পষ্টতার সুযোগ গ্রহণ করতে ছাড়েননি। তিনি এর অনুবাদে বলেছেন, “ত্রিশটি বড় জন্তু” [আল্লাহ প্রদত্ত অর্থনীতি ৪৭] অর্থাৎ পাঁচ যাওদ থেকে তিনি বুঝেছেন ত্রিশটি আর উট থেকে তিনি বুঝেছেন বড় জন্তু। প্রশ্ন হলো তিনি এই ত্রিশ সংখ্যাটি পেলেন কোথায়? স্পষ্ট বোঝা যায় তিনি উটের সাথে গরুকে কিয়াস করেছেন। যেহেতু হাদীসে গরুর ক্ষেত্রে ত্রিশ সংখ্যার কথা উল্লেখিত আছে। অথচ ফারুকী ফিতনার জবাব নামক পুস্তিকার ১৩ পৃষ্ঠায় তিনি নিজেই কিয়াস, ইজমা, মিথ্যা ফতোয়া বা মানুষের অনুসরণ না করে আল্লাহর কিতাব ও রসুলের সন্মতাকে আকড়ে ধরার ফতোয়া দিয়েছেন। বোঝা যাচ্ছে তার সে কথাও কেবল অন্য মানুষদের উপর প্রযোজ্য। অর্থাৎ অন্যরা কিয়াস করতে পারবে না কিন্তু তিনি যখন খুশি কিয়াস করবেন এমনকি যদি সে কিয়াস হাদীস বিরোধী হয় তবু তিনি তা থেকে পিছপা হবেন না। এখানে তিনি হয়তো মনগড়া ভাবে ত্রিশ সংখ্যাটি উল্লেখ করেছেন অথবা গরুর সাথে

কিয়াস করেছেন। ঘটনা যাই হোক এটা হাদীস বিরোধী হয়েছে। যেহেতু উপরোক্ত হাদীসে অস্পষ্টভাবে পাঁচ যাওদ বলা হলেও অন্য হাদীসে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, (إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ، فَفِيهَا شَاةٌ) “যদি উটের সংখ্যা পাঁচটি হয় তবে তাতে একটি ছাগল দিতে হবে” [বুখারী] এই হাদীসে পাঁচ যাওদ বলা হয়নি বরং সরাসরি পাঁচটি উট বলা হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় পাঁচ যাওদ বলতে পাঁচটি উট বোঝানো হয়েছে। কিন্তু কোরেশী সাহেব এই স্পষ্ট বক্তব্য গ্রহণ না করে বক্রতার সন্ধান করেছেন এবং স্পষ্ট হাদীস থাকতে কিয়াস করে বা সম্পূর্ণ মনগড়াভাবে উটের যাকাতে ত্রিশ সংখ্যাকে শর্ত করেছেন। শব্দ নিয়ে খেলা করার এটাও একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

ঘ) সদকা বা ইনফাক শব্দের অনেক অর্থ রয়েছে। কুরআনের অভিধানে কোরেশী সাহেব সদকা (صدقة) শব্দের অর্থ সম্পর্কে লেখেন, “সদকা, দান, যাকাত”। [৪৪৭ পৃষ্ঠা] আর ইনফাক (إنفاق) শব্দের অর্থ সম্পর্কে লেখেন, “খরচ, ব্যয়, দান, খরচ করা, ব্যয় করা, দান করা”। পরে তিনি ইনফাককে দুই ভাগে বিভক্ত করে একটিকে আল্লাহর হক বা যাকাত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। [১১১ পৃষ্ঠা] তার এই সব ব্যাখ্যা পুরোপুরি সঠিক। অর্থাৎ সদকা ও ইনফাক শব্দের আসলে এতগুলো অর্থ রয়েছে। কিন্তু এর সুযোগ নিয়ে তিনি কুরআন হাদীসের অনুবাদে যে কারামতি দেখিয়েছেন তা দুঃখজনক। তিনি নিজের খেয়াল খুশি মতো কুরআন-হাদীসের কোথাও সদকা অর্থ করেছেন ফরজ যাকাত আবার কোথাও নিজের মন মতো বলেছেন ব্যক্তিগত দান। ইনফাকের ক্ষেত্রে একই কাজ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, উপরে উল্লেখিত সূরা তাওবার ৭৯ নং আয়াতে স্বেচ্ছায় দান করার বিষয়টি উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও উক্ত আয়াতে ব্যবহৃত সদকা শব্দের পাশে তিনি লিখেছেন ‘যাকাত’। এর মাধ্যমে তিনি গায়ে খাটা লোকদের উপর যাকাত প্রদান আবশ্যিক প্রমাণ করেছেন। অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে (مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلٍ ثَمْرَةٍ) “যদি কেউ হালাল উপার্জন থেকে একটি খেজুরও সদকা করে” [বুখারী ও মুসলিম] এই হাদীসের সদকার পাশে কোরেশী সাহেব লিখেছেন, “যাকাত হিসেবে প্রদান করিবে” [আল্লাহ প্রদত্ত অর্থনীতি পৃষ্ঠা ৪০] এখানেও তিনি কম বেশি যে কোনো সম্পদে যাকাত প্রমাণ করার জন্য সদকা শব্দের যাকাত অর্থ করেছেন। অথচ অন্য একটি আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন, (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَبِعَمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْثَرُوهَا الْفُقَرَاءُ) “তোমরা যদি প্রকাশ্যে সদকা আদায় করো তবে তা উত্তম আর যদি তা গোপনে অভাবীদের প্রদান করো তবে তাই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম। [বাকারা/২৭১] আল্লাহ প্রদত্ত অর্থনীতি নামক গ্রন্থের ২৩ পৃষ্ঠায় তিনি এই আয়াতের সদকা শব্দের অর্থ

করেছেন দান তথা ব্যক্তিগত খরচ-খরচা। পাঠক লক্ষ্য করুন যেখানে স্বেচ্ছায় দান করার কথা উল্লেখ আছে সেখানে তিনি অর্থ করলেন যাকাত তথা আবশ্যিক দান আর যেখানে আমভাবে সদকার কথা বলা আছে সেখানে যাকাত, দান ইত্যাদি সকল সদকাকে না বুঝে নিজের মনমতো তিনি অর্থ করলেন ব্যক্তিগত দান। কারণ এই আয়াতে যাকাতের অর্থ গ্রহণ করলে প্রমাণিত হয় যে কেউ গোপনে অভাবীদের দান করে দিলে সেটাই উত্তম। কিন্তু যাকাতের ব্যাপারে কোরেশী সাহেবের মত হলো, “একজন ধর্মীয় নেতার হাতে অবশ্যই প্রদান করিতে হইবে নচেৎ আদায় হইবে না”। [আল্লাহ প্রদত্ত অর্থনীতি পৃষ্ঠা ৬] এই মতবাদকে টিকানোর জন্য তিনি এই আয়াতে ব্যবহৃত সদকার আম অর্থকে নিজের মনমতো খাস করে দিয়ে বলেছেন এটা ব্যক্তিগত খরচ-খরচার ক্ষেত্রে। প্রশ্ন হলো, এভাবে নিজের মন মতো এক স্থানে সদকাকে যাকাত হিসেবে আর অন্য স্থানে ব্যক্তিগত দান হিসেবে গণ্য করার অধিকার তিনি কোথায় পেয়েছেন? কুরআন-হাদীসের কোথাও তো এমন টিকা-টিপ্পনি খুঁজে পাওয়া যায় না। বরং এসবই তার মনগড়া কথা। যদিও তিনি বারংবার মানুষের ফতোয়া অমান্য করার কথা বলেছেন। প্রশ্ন হলো তবে তিনি নিজে নিজেকে কি মনে করেন? মানুষ না অন্য কিছু? সদকার মতোই ইনফাক ও অন্য অনেক শব্দের ক্ষেত্রে তিনি একই নীতি অবলম্বন করেছেন। নিরোপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর যে কোনো মানুষের উচিত এমন দ্বিমুখী নীতি পরিহার করা।

ঙ) উপরে আমরা একই শব্দের বিভিন্ন অর্থের মধ্যে খেয়াল খুশি মতো যেখানে যেটি খুশি ব্যবহার করার প্রমাণ পেয়েছি। এর চেয়েও বেশি মারাত্মক একটি রোগ কোরেশী সাহেবের রয়েছে। তা হলো, নিজে থেকে কুরআন-হাদীসের মাঝে-মধ্যে তালি-পট্টি যোগ করা। উপরে রোপার নিসাব সম্পর্কিত হাদীসে আমরা এর একটি উদাহরণ দেখেছি। আমরা দেখেছি তিনি ঐ হাদীসের অনুবাদের ভিতরে বিভিন্ন স্থানে ব্রাকেট দিয়ে নিজের পক্ষ থেকে ‘উপার্জিত টাকা-পয়সা’, ‘গচ্ছিত রোপ্য বা টাকা-পয়সা’ ইত্যাদি শব্দ যোগ করেছেন। প্রশ্ন হলো, একই হাদীসের এক স্থানে উপার্জিত আর অন্য স্থানে গচ্ছিত অর্থ তিনি কিসের ভিত্তিতে করলেন? এর স্বপক্ষে কি কুরআন-হাদীসের কোনো দলীল আছে? তাহলে দলীল ছাড়াই তার এই বক্তব্য কিভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে!

ফল-ফসল সম্পর্কে একটি আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, (كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ) “তার ফল থেকে আহার করো এবং কর্তনের দিন তার হক প্রদান করো” [আনয়াম/১৪১] কোরেশী সাহেব এখানে অনুবাদের মধ্যে বলেছেন, “(অভাব থাকিলে)

খাও” [আল্লাহ প্রদত্ত অর্থনীতি পৃষ্ঠা ২৭] প্রশ্ন হলো, এই অভাব থাকিলে কথাটা তিনি কোথা থেকে নিয়ে আসলেন। নিজের পক্ষ থেকে কুরআনের আয়াতের মধ্যে এমন অতিরিক্ত শব্দ যোগ করে দেওয়ার ক্ষমতা কি কারো আছে? তার অনুসারীরা হয়তো বলবে, এসব হলো ব্যাখ্যা। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন হলো, ব্যাখ্যাই যদি হয় তবে সাহাবা, তাবেয়ী, তাবা তাবেয়ী এবং পূর্ববর্তী বরেন্য ওলামায়ে কিরামের ব্যাখ্যার বদলে তার ব্যাখ্যা কেনো গ্রহণ করা হবে?

এখানে আরো একটি বিষয় লক্ষণীয়। তা হলো, কোরেশী সাহেব বারংবার বলেছেন কুরআন বিরোধী হাদীস গ্রহণ করা হবে না। এই মতবাদের উপর তিনি বাস্তব আমলও করেছেন। উদাহরণস্বরূপ পবিত্র কুরআনে জেনাকারীকে বেত্রাঘাত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর রসুলুল্লাহ ﷺ এর হাদীস সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে বেত্রাঘাতের বিধান অবিবাহিত নারী-পুরুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিন্তু বিবাহিতের ক্ষেত্রে রজম। রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, (النَّيْبُ جُلْدُ مِائَةٍ، ثُمَّ رَجْمٌ بِالْحِجَارَةِ، وَالْبَكْرُ جُلْدُ مِائَةٍ) “বিবাহিতের ক্ষেত্রে একশ বেত্রাঘাত এবং পরে পাথর দ্বারা রজম করা আর অবিবাহিতের ক্ষেত্রে কেবল একশ বেত্রাঘাত। [মুসলিম] কোরেশী সাহেব এবং তার অনুসারীরা এই হাদীসটিকে কুরআনবিরোধী হওয়ার কারণে বাতিল আখ্যায়িত করে রজমের বিধানটি অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, “বিবাহিত নারী পুরুষের জন্য রজম করিবার হাদীস ও ফতোয়া বাতিল বা গ্রহণযোগ্য নহে” [পরস্পরবিরোধী হাদীস পৃষ্ঠা ১১৩]

লক্ষণীয় বিষয় হলো, এখানে পবিত্র কুরআনে আমভাবে জেনাকারীকে বেত্রাঘাত করার কথা আছে আর হাদীসে ঐ বিধানটির ব্যাখ্যা দিয়ে বিবাহিত ও অবিবাহিতের মাঝে পার্থক্য করা হয়েছে। অন্য কথায় বলা যায়, রসুলুল্লাহ ﷺ উক্ত আয়াতের মাঝে সামান্য টিকা যোগ করেছেন। ঐ হাদীসের আলোকে বেত্রাঘাতের আয়াতের অনুবাদ আমরা এভাবে লিখতে পারি,

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

জেনাকারী পুরুষ বা নারী (অবিবাহিত হলে) একশত বেত্রাঘাত করো (বিবাহিত হলে পরে রজম করো)। [নূর/২]

কোরেশী সাহেব ও তার অনুসারীদের মতে রসুলুল্লাহ ﷺ এতটুকুও করতে পারেন না। অথচ মহান আল্লাহ নিজেই রসুলুল্লাহ ﷺ কে কুরআন ব্যাখ্যা করে বোঝানোর দায়িত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেন, (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ) “তোমার উপর আমি যিকির অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানুষের নিকট তা স্পষ্টভাবে বাতলে দাও” [নাহল/৪৪] দেখা যাচ্ছে

রসূল ﷺ কুরআন ব্যাখ্যার দায়িত্ব স্বয়ং রব্বুল আলামীনের তরফ থেকে লাভ করেছেন। এনারা তার ব্যাখ্যাই মেনে না নিয়ে কুরআন বিরোধী আখ্যায়িত করে পরিত্যাগ করছেন। বিপরীতে কোরেশী সাহেব নিজে বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসের মধ্যে এর চেয়ে ঢের বেশি টিকা-টপ্পনী ও তালি-পট্টি লাগিয়েছেন যা আমরা উপরে দেখেছি। তবে কি কোরেশী সাহেবের জ্ঞান গরিমা ও ক্ষমতা স্বয়ং রসুলের চেয়েও বেশি! [নাউযু বিল্লাহ] যদি তা না হয় তবে রসুলের ব্যাখ্যাগুলোকে কুরআনবিরোধী আখ্যা দিয়ে বাতিল ঘোষণা করে নিজের পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ যোগ করার মানেটা কি? আশা করি বুদ্ধিমান পাঠক বিষয়টি ভেবে দেখবেন।

### ৩ নং বিভ্রান্তি:- উপার্জিত সম্পদে নিসাব শর্ত নয়।

কোরেশী সাহেবের একটি বিভ্রান্তি হলো তিনি উপার্জিত সম্পদের যাকাতের ক্ষেত্রে কোনো নিসাব শর্ত করেন না। তার মতে ধনী গরীব যে কেউই প্রতিদিনকার উপার্জন থেকে যাকাত আদায় করবে তার পরিমাণ যাই হোক না কেনো। উদাহরণস্বরূপ, যদি কেউ দিন এক শত টাকা উপার্জন করে তবে তা থেকে আড়াই টাকা যাকাত হিসেবে প্রদান করবে এবং বাকী টাকা পরিবার-পরিজনের পিছনে ব্যয় করবে। মহান আল্লাহর বানী আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক হতে তারা ব্যয় করে এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, “কম বা বেশি জীবিকা হিসাবে তারা যাহাই পায় তাহা হইতে আল্লাহ ও মানুষের হক আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে আদায় করে” [আল্লাহ প্রদত্ত অর্থনীতি ১৪] এই কথাটি প্রমাণ করার জন্য তিনি বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসের অর্থকেও বিকৃত করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, মহান আল্লাহ বলেন, (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ) “এবং যখন তাদের বলা হয় আল্লাহ তোমাদের যা রিযিক দিয়েছেন তা থেকে ব্যয় করো” [ইয়াসীন/৪৭] কোরেশী সাহেব এর অনুবাদে লেখেন, “এবং যখন তাহাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ তোমাদের (কম বা বেশী) যে জীবিকা দান করিয়াছেন তাহা হইতে (অভাবী মানুষের জন্য) খরচ করো” এই আয়াতের মধ্যে তিনি দুটি স্থানে তালি পট্টি লাগিয়েছেন। প্রথমে যোগ করেছেন কম বা বেশী শব্দটি পরে বলেছেন অভাবী মানুষের জন্য। শেষের কথাটির স্বপক্ষে হাদীসে প্রমাণ পাওয়া যায় কিন্তু প্রথম কথাটি সম্পূর্ণ মনগড়া কথা। কোনো হাদীসে কম বেশী যাই হাতে আসে তা থেকে ব্যয় করতে বলা হয়নি। উল্টো হাদীসে বিভিন্ন প্রকার সম্পদের একটা পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যার কমে যাকাত দিতে হবে না বলে স্পষ্ট ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَّةِ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ، فَفِيهَا خُمْسُهُ

তোমরা রোপার সদকা প্রদান করো। প্রতি চল্লিশ দিরহামে এক দিরহাম আর এক শত নিরানব্বই দিরহামেও কিছু দিতে হবে না। যখন দুই শত দিরহাম হবে তখন পাঁচ দিরহাম দিতে হবে। [আবু দাউদ]

এই হাদীসের প্রকৃত অনুবাদ এই। কোরেশী সাহেব অবশ্য নিজের মতবাদ প্রমাণ করার জন্য হাদীসের মধ্যে মনগড়া টিকা-টিপ্পনি যোগ করেছেন। তিনি হাদীসের অনুবাদ করেছেন এমন,

তোমরা রোপ্যের (উপার্জিত টাকা পয়সার) সদকা (যাকাত) প্রদান করিও প্রত্যেক চল্লিশ দেরহামে এক দেরহাম (চল্লিশ টাকায় এক টাকা) এবং (গচ্ছিত রোপ্য বা টাকা পয়সায়) এক শত নব্বই এ (যাকাত) নাই কিন্তু (গচ্ছিত) রোপ্য (টাকা পয়সা) দুই শত দেরহামে পৌঁছিলে তখন উহাতে পাঁচ দেরহাম (দিতে হবে)। [আল্লাহ প্রদত্ত অর্থনীতি পৃষ্ঠা ৪৫]

এই সব তালি-পট্টি যোগ করে তিনি প্রমাণ করেছেন উপার্জিত সম্পদ কম বেশি যাই হোক তাতে যাকাত ফরজ হবে আর গচ্ছিত সম্পদ হাদীসে উল্লেখিত নিসাব পরিমাণের কম হলে তাতে যাকাত ফরজ হবে না।

উপরে আমরা বলেছি, কুরআন হাদীসের দলীল প্রমাণ ছাড়াই মানুষের মনগড়া ফতোয়ার কোনো মূল্য নেই। এটা স্মরণ রাখলেই কোরেশী সাহেবের সব ছল চাতুরী মাঠে মারা যাবে। হাদীসের মধ্যে তিনি যেসব তালি-পট্টি লাগিয়েছেন সেগুলো বাদ দিলেই প্রমাণিত হবে সম্পদের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ রয়েছে যার কমে যাকাত ফরজ হয় না। এখন রসুলুল্লাহ ﷺ যেহেতু আমভাবে কথাটা বলেছেন তাই উপার্জিত বা গচ্ছিত যে কোনো সম্পদের ক্ষেত্রে কথাটা প্রযোজ্য হবে। নিজের পক্ষ থেকে এখানে উপার্জিত আর গচ্ছিতের মাঝে কোনো পার্থক্য করার মতো দুঃসাহস আর কি হতে পারে!

অনেকে অবশ্য এখানে একটা কুতর্কের অবতারণা করে। হাদীসে চল্লিশ টাকায় এক টাকা আর দুইশ দিরহামের কমে যাকাত নেই এর মাঝে একটা ওয়া (و) শব্দ আছে। এ থেকে তারা প্রমাণ করতে চায় দুটো দুই বিষয়।

প্রশ্ন হলো যদি মেনেও নিই যে দুটো দুই বিষয় তবু তার মধ্যে একটি উপার্জিত সম্পদের ব্যাপারে আর অন্যটি গচ্ছিত সম্পদের ব্যাপারে এটা কিভাবে প্রমাণিত হয়? এমনও তো হতে পারে যে প্রথমটি গচ্ছিত সম্পদের ব্যাপারে আর পরেরটি উপার্জিত সম্পদের ব্যাপারে। অর্থাৎ উপার্জিত সম্পদ উক্ত পরিমাণ না হওয়া পর্যন্ত যাকাত হবে না তবে



গচ্ছিত সম্পদের পরিমাণ কম বেশি যাই হোক তাতে যাকাত ফরজ হবে। মনগড়া ব্যাখ্যা যদি করতেই হয় তবে এই ব্যাখ্যাই অধিক যৌক্তিক। যেহেতু নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, কুলি মজুররা গায়ে খেটে যা দুই একশ টাকা ইনকাম করে তার মধ্যে ভাগ বসানোর চেয়ে যারা নিজেদের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের পরও কম-বেশি অর্থ-সম্পদ গচ্ছিত বা পুঞ্জিভূত করে রাখে তাদের সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ করার ব্যাপারেই অধিক কড়াকড়ি করা উচিত। এ হিসেবে উপার্জিত সম্পদের ক্ষেত্রে নিসাব শর্ত করে একটু ছাড় দেওয়া এবং উপার্জনের দিকে মানুষকে আকৃষ্ট করা আর গচ্ছিত বা পুঞ্জিভূত সম্পদের ক্ষেত্রে নিসাব শর্ত না করে কম বেশী যাই জমা করুক তাতে যাকাত দিতে হবে এমন বলে মানুষকে সম্পদ পুঞ্জিভূত করা হতে অনুৎসাহিত করাই কি অধিক যৌক্তিক নয়? যদি নিজের মন মতোই ব্যাখ্যা করতে হয় তবে এটাই কি অধিক ইনসাফ নয়।

কিন্তু আসল কথা হলো, ইনসাফ বে ইনসাফের হিসাব আমাদের কাছে নয়। আল্লাহ ও তার রসুল যা বলেছেন সেটাই ইনসাফ। সে হিসেবে হাদীসে যেহেতু আমভাবে যে কোনো সম্পদে নিসাব শর্ত করা হয়েছে তাই আমাদের তা মেনে নিতে হবে। নিজের পক্ষ থেকে উপার্জিত আর গচ্ছিতের মাঝে পার্থক্য করা বৈধ হবে না।

এখন মাঝে একটা ওয়া (و) তথা এবং শব্দ আছে তাই এখানে পৃথক দুটো বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে একই বিষয়ে নয় এমন দাবী যারা করেন তারা আরবী ভাষার উপরে অত্যন্ত কম জ্ঞান রাখেন। আরবীতে ওয়া (و) অর্থ ও, এবং, আর ইত্যাদি বিভিন্নরকম হয়। অনেক সময় একই বিষয় একটু বিস্তারিত বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য ওয়া শব্দ ব্যবহার করা হয়। যেমন, মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআন সম্পর্কে বলেন, (إِنْ هُوَ إِلَّا) “এটা তো কেবল যিকির এবং কুরআন”। [ইয়াসীন/৯] এখানে পবিত্র কুরআন সম্পর্কে যিকির ও কুরআন এই দুটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। দুটি শব্দের মাঝে ওয়া (و) ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ কি এই যে, এখানে দুটো পৃথক জিনিসকে বোঝানো হচ্ছে! বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই বুঝতে পারবেন যে, এখানে দুটো পৃথক বিষয়ে কথা বলা হচ্ছে না বরং যিকির ও কুরআন উভয় শব্দ দ্বারা একই জিনিস তথা আল্লাহর কিতাবকেই উদ্দেশ্য করা হচ্ছে। যেহেতু যিকির মূলত পবিত্র কুরআনেরই একটি নাম। অন্য আয়াতে এসেছে, মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন ঈসা ﷺ কে বলবেন, (عَلَّمَكَ) (الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْقُرْآنَ وَالْإِنجِيلَ) “আমি তোমাকে কিতাব, হিকমাত এবং তাওরাত ও ইনজিল শিক্ষা দিয়েছি। [মায়দা] এই আয়াতে ঈসা ﷺ কে কিতাব, হিকামাত,

তাওরাত ও ইনজিল শেখানোর কথা বলা হয়েছে আর প্রতিটি বিষয়ের মাঝে ওয়া (و) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ কি এই যে এগুলো সবই পৃথক পৃথক জিনিস। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন হলো, কিতাব বলতে এখানে কি বোঝানো হয়েছে? বুদ্ধিমান পাঠক জানেন যে কিতাব বলতে এখানে তাওরাত ইনজিলকেই বোঝানো হয়েছে অন্য কিছু নয়। এরকমই আরেকটি আয়াত হলো, (وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ) “আমি আপনাকে বারবার তেলোয়াত করা হয় এমন সাতটি আয়াত প্রদান করেছি এবং মহান কুরআন প্রদান করেছি। [হিজর/৮৭] এখানে সাত আয়াত বলতে সূরা ফাতেহাকে বোঝানো হয়েছে পরে ওয়া শব্দ যোগ করে আবার মহান কুরআনের কথা বলা হয়েছে। এর অর্থ কি এই যে, সূরা ফাতিহা কুরআনের অংশ নয়? ভীষণ অজ্ঞ লোকেরাই এসব কথা বলে থাকে।

পাঠক লক্ষ্য করুন, এমন অজ্ঞতা ও মূর্খতার উপর ভিত্তি করে ওয়া (و) শব্দের ভুল ব্যাখ্যার মাধ্যমে হাদীসের মধ্যে মনগড়াভাবে কোথাও উপার্জিত আর কোথাও গচ্ছিত অর্থ গ্রহণ করে যাকাত সম্পর্কে একটা মতবাদ প্রতিষ্ঠা করা কত বড় ধৃষ্টতা!

অথচ যে সত্য অনুসন্ধান করে তার জন্য রসুলুল্লাহ ﷺ এর কথার মধ্যে সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। উপরের হাদীসটিই এর প্রমাণে যথেষ্ট। যেহেতু সেখানে আমভাবে রোপা তথা টাকা-পয়সাতে পাঁচ উকিয়া তথা দুইশ দিরহামের কমে যাকাত নেই বলা হয়েছে। সন্ধিগত বা গচ্ছিতের মাঝে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। এখন হাদীসের আম অর্থ পরিত্যাগ করে যে বা যারা নিজের পক্ষ থেকে সন্ধিগত ও গচ্ছিতের মাঝে পার্থক্য করবে তা হাদীসবিরোধী মানুষের ফতোয়া বলে গণ্য হবে এবং পরিত্যক্ত হবে। এই মূলনীতির আলোকেই কোরেশী সাহেবের মতবাদ খণ্ডিত হয়ে যায়। তাছাড়া অন্য হাদীসে স্পষ্ট করে রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ دُرْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ

পাঁচ ওয়াসাকের কম খেজুরে সদকা নেই আর পাঁচ উকিয়ার কম রোপ্যে সদকা নেই আর পাঁচ যাওদের কম উটে সদকা নেই। [বুখারী ও মুসলিম]

লক্ষণীয় বিষয় হলো, এই হাদীসে রসুলুল্লাহ ﷺ রোপা, উট ও খেজুরের একটা পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছেন যার কমে সদকা নেই। উপরে আমরা বলেছি সদকা বলতে সাধারণ দানও বোঝায় আবার ফরজ যাকাতও বোঝায়। সামান্য চিন্তা করলেই বোঝা যাবে এখানে আসলে ফরজ যাকাতের কথাই বলা হচ্ছে যেহেতু নফল দান বা ব্যক্তিগত

খরচ খরচার ক্ষেত্রে সম্পদের সর্বনিম্ন পরিমাণ নির্ধারণ করে দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ নফল দান কম বেশি যে কোনো সম্পদ থেকে করা যায় একইভাবে হাতে কম বেশি টাকা-পয়সা ও অর্থ-সম্পদ যাই থাক বাবা-মা বা স্ত্রী-সন্তানের উপর ব্যক্তিগত খরচ-খরচাও করা লাগে। অতএব এই হাদীসে সদকা অর্থ যাকাতই হবে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ফারুকী ফিতনার জবাব নামক পুস্তিকার ৩৩ পৃষ্ঠায় কোরেশী সাহেব নিজেও এটা স্বীকার করেছেন। তিনি এই হাদীসের অনুবাদে সদকা শব্দের পাশে যাকাত শব্দই লিখেছেন। এমনকি পাঁচ ওসাকের অনুবাদে ত্রিশ মন ফসলের কথাও বলেছেন। তবে পরবর্তীতে এ ব্যাপারে বলেছেন, “একমাত্র সম্বন্ধে সম্পদের জন্য প্রযোজ্য এবং ইহা মূল যাকাত নহে। উপার্জন, ফসল ও পশুপালের যাকাতই মূল যাকাত”। পরে তিনি এই সব হাদীসের উপর নির্ভর করে সব জায়গায় নিসাব শর্ত করার চরম নিন্দা করেছেন। পরে তিনি নিজেই বলেছেন, “প্রকৃত পক্ষে নিসাব শুধুমাত্র গচ্ছিত সম্পদ ও পশুপালের জন্য প্রযোজ্য।” দেখা যাচ্ছে তিনি প্রথমে পশুপালের যাকাতকে মূল যাকাত হিসেবে স্বীকার করেছেন আবার পরে বলেছেন, পশুপালের যাকাতেও নিসাব প্রযোজ্য এ থেকে বোঝা যায় মূল যাকাতের মধ্যেও নিসাব প্রযোজ্য। অথচ পূর্বে যাকাতকে মূল বা অমূল এই দুই ভাগে ভাগ করে সব জায়গায় নিসাব শর্ত করার কারণে তিনি হুজুরগণকে চরম নিন্দা করলেন। এমন দ্বিমুখি কথা-বার্তা শুনে মনে হয় তার মাথায় কোনো গন্ডগোল ছিলো। ভক্তদের উচিত ছিলো তৎক্ষণাত্ তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। তা না করে তারা তার ভুলভাল কথার উপরই আমল করা শুরু করে দিয়েছে। মোট কথা এই সব উল্টা-পাল্টা কথার মধ্যে কোরেশী সাহেব কিছু হাদীসের বক্তব্যের বিরুদ্ধে গেছেন। যদিও হাদীসের মাঝে বিভিন্ন টিকা-টিপ্পনী যোগ করে তিনি নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছেন কিন্তু আমরা বলেছি হাদীস বিরোধী মানুষের ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব এই সকল হাদীস অনুযায়ী পশুপাল, ফল-ফসল, টাকা পয়সা তা উপার্জিত হোক বা গচ্ছিত হোক ইত্যাদি সম্পদে নিসাব প্রমাণিত হয়। যদিও একেক প্রকার সম্পদের নিসাব একেক রকম যেমনটি হাদীসে বর্ণিত আছে।

কোরেশী সাহেব এবং তার অনুসারীদের সামনে কেবল দুটি রাস্তা খোলা আছে। হয়তো তারা উপার্জিত সম্পদে নিসাব শর্ত নয় এই মর্মে কোনো আয়াত বা সহীহ হাদীস পেশ করবেন অথবা এই সকল সহীহ হাদীসের আম বক্তব্যকে মেনে নিয়ে পশুপাল, ফল-ফসল, টাকা-পয়সা ইত্যাদি সম্পদে নিসাব শর্ত করবেন তা উপার্জিত হোক বা গচ্ছিত হোক। এটাই হবে সঠিক সিদ্ধান্ত। আর যদি কেউ বাড়াবাড়ি করে বলে, কুরআনবিরোধী হাদীস মানি না তাকে বলবো, তাহলে কোনো হাদীসই আপনি দলীল হিসেবে পেশ

করবেন না। যেহেতু মহান আল্লাহ আমভাবে রিযিক থেকে ব্যয় করতে বলেছেন কোনো নিসাব বা পরিমাণ যেমন ঠিক করে দেননি আড়াই পারসেন্টও ঠিক করে দেননি। অতএব, আপনারা হয়তো সমাজতান্ত্রিকদের মতো নিজের পুরা সম্পত্তি ধর্মীয় নেতার হাতে অর্পণ করবেন অথবা যার যতটুকু খুশি একটি অংশ ব্যয় করাই যথেষ্ট এমন জ্ঞোগান তুলে যে যা দেয় তা আড়াই পারসেন্টের কম হলেও যাকাত আদায় হয়ে যাবে এমন মতবাদ গ্রহণ করবেন। হাদীস মানতে হলে মানার মতো মানবেন নয়তো সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলবেন। তা না করে ইচ্ছামত কোনো হাদীসের আংশিক গ্রহণ আর আংশিক বর্জন করা বা মতের পক্ষে গেলে ঢাক ঢোল পিটিয়ে বয়ান করা আর বিপক্ষে গেলে গোপন করা বা মাঝে তালি-পট্টি লাগিয়ে অপব্যাত্যা করার মতো দ্বিমুখী আচরণ করবেন না। তাতে আল্লাহর দরবারে অবশ্যই ধরাশায়ী হবেন। একবার ভাবুন তো এভাবে কুরআন-হাদীস অমান্য করে এবং পূর্ববর্তী সকল সাহাবী ও মুজতাহিদ আলেমদের বিরুদ্ধে গিয়ে কোনো এক আত্মভোলা লোকের উদ্ভট কথার অনুসরণ করার ব্যাপারে আল্লাহর দরবারে আপনারা কি ওজর দেবেন?

### ৪ নং বিভ্রান্তিঃ- উপার্জিত সম্পদে বছর গননার বিষয়টি অস্বীকার করা।

কোরেশী সাহেব এ ব্যাপারেও উপার্জিত সম্পদ আর গচ্ছিত সম্পদের মাঝে পার্থক্য করেছেন। এক্ষেত্রেও তিনি সেই একই কৌশল অবলম্বন করেছেন। হাদীসে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, (مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْخَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ) “যে কেউ কোনো মাল অর্জন করে তার নিকট ঐ মালের উপর এক বছর অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তাতে যাকাত নেই। [তিরমিযী] কোরেশী সাহেব আল্লাহ প্রদত্ত অর্থনীতির ৪৮ পৃষ্ঠায় “কতদিন পর্যন্ত গচ্ছিত বা মওজুদ মাল জমা করিয়া রাখিলে যাকাত প্রদান করিতে হইবে না” শিরোনামে এই হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। তিনি এর অনুবাদ করেছেন এমন, “যে ব্যক্তি কোনো মাল লাভ করিয়াছে তাহাতে যাকাত হইবে না যতক্ষণ না উহার উপর বৎসর অতিক্রান্ত হয়। এখানে তিনি অর্জন করিয়াছে এর বদলে লাভ করিয়াছে শব্দ ব্যবহার করেছেন। বাংলাতে লাভ করা শব্দটি অনেক সময় পাওয়া বা অর্জন করা অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয়, “জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করেছে অর্থাৎ মুক্তি পেয়েছে বা মুক্তি অর্জন করেছে। এ হিসেবে আমাদের অনুবাদের সাথে তার অনুবাদের মিল রয়েছে। লাভ করার আরেকটি অর্থ হয় বেঁচা-কেনা, ব্যবসা ইত্যাদিতে লাভ করা। কোরেশী সাহেব যদি এখানে ব্যবসায় লাভ করা অর্থ উদ্দেশ্য করে থাকেন তবে প্রমাণিত হয় ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ সম্পদের

যাকাত বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর প্রদান করতে হয়। অথচ তার মতে, উপার্জিত সম্পদের যাকাত তৎক্ষণাৎ প্রদান করতে হবে। আর যদি তার উদ্দেশ্য হয় পাওয়া বা অর্জন করা তাহলে এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়, যে কোনোভাবে পাওয়া বা অর্জন করা অর্থ সম্পদের উপর অর্জনের দিন থেকে শুরু করে এক বছর অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত যাকাত ফরজ নয়। এখানে আমভাবে যে কোনো অর্থ সম্পদের কথা বলা হয়েছে উপার্জিত বা গচ্ছিত এর মাঝে মোটেও পার্থক্য করা হয়নি। অতএব, নিজের পক্ষ থেকে এই হাদীসের ব্যাখ্যার মধ্যে গচ্ছিত শব্দটি ঢুকিয়ে দেওয়া চরম অন্যায়। কোরেশী সাহেব একই সাথে দুই নৌকায় পা দিয়েছেন। একদিকে তিনি গচ্ছিত সম্পদের ব্যাপারে বছর গণনার হাদিসটিকে দলীল হিসেবে গণ্য করেছেন অন্যদিকে উপার্জিত সম্পদের ক্ষেত্রে তিনি হাদীসটিকে পরিত্যাগ করেছেন। অথচ হাদীসে আমভাবে অর্জিত যে কোনো সম্পদের যাকাত তৎক্ষণাৎ আবশ্যিক হয় না বরং এক বছর অতিবাহিত হলে আবশ্যিক হয় বলে ঘোষণা করা হয়েছে। অর্থাৎ এখানেও তিনি দ্বিমুখী নীতি ও মনগড়া ব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন।

**৫ নং বিভ্রান্তি:- উপার্জিত সম্পদ থেকে ধনী গরীব সবাইকে যাকাত দিতে হবে**

উপার্জিত সম্পদে নিসাব ও বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত না করার কারণে স্বাভাবিক ফলাফল দাড়িয়েছে ধনী-গরীব যে কেউ যা কিছু উপার্জন করে তাকে তার যাকাত আদায় করতে হবে। কোরেশী সাহেব বিভিন্ন স্থানে স্পষ্টভাবেই একথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, “ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে যাকাত প্রদান করিতে হইবে”। [আল্লাহ প্রদত্ত অর্থনীতি ২৭ পৃষ্ঠা] পরে তিনি ঐ আয়াত উল্লেখ করেন যেখানে বলা হয়েছে “শয়তান তোমাদের অভাবের ভয় দেখায় আর অসৎ কাজের আদেশ করে ...” [বাক্বারা/২৬৮] এই আয়াতে যাকাত, সদকা, ইনফাক ইত্যাদি কোনো শব্দই উল্লেখ নেই যার মাধ্যমে অভাবী অবস্থায় যাকাত দেওয়ার কথা প্রমাণ করা যায়। তবু কোরেশী সাহেব উদ্ভট সব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ উল্লেখ করে তাই প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। আগ্রহী পাঠক তার লেখাটা স্বচক্ষে পাঠ করে ফায়দা হাসিলের চেষ্টা করতে পারেন।

সূরা তাওবার গায়ে খাটা লোকদের সদকা করার বিষয়ে অবতীর্ণ আয়াতটি থেকেও কোরেশী সাহেব ধনী-গরীব সবার নিকট থেকে যাকাত গ্রহণ ফরজ প্রমাণ করতে চেয়েছেন। অথচ সেই আয়াতের মধ্যেই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে দান করার কথা উল্লেখ আছে। পূর্বে আমরা এ বিষয়ে তার বিভ্রান্তি খন্ডায়ন করেছি।

এছাড়া উক্ত গ্রন্থের ৪০ ও ৪১ পৃষ্ঠায়, অভাবের ভয় আছে এমন অবস্থায় সদকা করা

এবং এমনকি জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে এনে বাজারে বিক্রয় করে খাওয়া ও সাদকা করা, একটি খেজুরও সদকা করা ইত্যাদি বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত কিছু হাদীস উল্লেখ করেছেন। সেখানে অবশ্য সদকা শব্দ উল্লেখ আছে আর কোরেশী সাহেব যথারীতি নিজের পক্ষ থেকে পাশে যাকাত শব্দ লিখে নিয়েছেন। প্রশ্ন হলো, একটিমাত্র খেজুর সদকা করার কথা শুনেও কি কোরেশী সাহেবের একবারও মনে হলো না যে, এটা নফল সদকাও হতে পারে! হাদীসে যেহেতু স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে যে, পাঁচ ওয়াসাকের কম খেজুরে যাকাত হয় না আর পাঁচ ওয়াসাকের আড়াই পারসেন্ট কখনও একটি খেজুর হয় না। এটা স্মরণ রেখে এবং বক্রতা পরিহার করে সুস্থ মস্তিষ্কে চিন্তা করলে একটি খেজুর দান করার বিষয়টি নফল সাদকা মনে করা ছাড়া কোনো উপায় আছে কি? তবু জোর করে নিজের মন মতো একটি খেজুর দান করার হাদীসকে ফরজ সাদকা আর পাঁচ ওয়াসাকের হাদীসের মধ্যে নিজের পক্ষ থেকে গচ্ছিত সম্পদ লিখে দিয়ে কুরআন হাদীসকে বিকৃত করার কোনো প্রয়োজন আছে কি?

একটি হাদীসে অবশ্য কোরেশী সাহেব বেশ শক্ত দলীল পেয়েছেন। রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, (عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ) “প্রতিটি মুসলমানের উপর সদকা দেওয়া দায়িত্ব” [বুখারী ও মুসলিম] ফারুকী ফিতনার জবাব নামক গ্রন্থের ৩৬ পৃষ্ঠায় হাদীসটি উল্লেখ করে কোরেশী সাহেব বেশ বড়াই করে বলেন, “হুজুরগণ ইহাকে সাধারণ বা নফল দানের হাদিস বলিয়াছেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা ফরজ দান যাকাতের হাদিস। কারণ ইহাতে আলাকুল্লে মুসলেমিন সাদাকাতুন” বলা হইয়াছে এবং আরবীতে “আলা” শব্দ ফরজ অর্থেই ব্যবহৃত হয়।”

এতক্ষণে কোরেশী সাহেব একটা কাজের মতো কাজ করেছেন। পাঁকা পন্ডিতের মতো আরবী ভাষা আর ব্যাকরণ থেকে যুৎসই একটা দলীল হাজির করেছেন আরবী “আলা” শব্দের খেলা দেখিয়ে তিনি হুজুরগণকে যথেষ্ট শিক্ষা দিয়েছেন। প্রশ্ন হলো, তিনি এতই যখন বোঝেন তাহলে আগের হাদীস গুলোর দলীল কেনো দিলেন। সেখানে তো “আলা” শব্দ উল্লেখ নেই, কেবল সদকা শব্দ উল্লেখ আছে। আর এই সদকা শব্দ দিয়ে “আলা” বাদেই শুধু গলাবাজি করেই তিনি একটি খেজুর দান করাকেও ফরজ যাকাত হিসেবে গণ্য করেছেন। আমার মনে হয়, “আলা” শব্দের অর্থ সম্পর্কে যার জানা আছে তার উচিৎ ছিলো, যে হাদীসে “আলা” নেই সেখানে গলাবাজি না করা। কোরেশী সাহেব অবশ্য এসব নিয়ম কানুন মানেন না। নিজের পক্ষে হলে কেবল “আলা” কেনো পিঠে ছালা বেধেও মাঠে নেমে পড়তে রাজি আছেন তিনি। কিন্তু কোনো হাদীস তার বিপক্ষে গেলেই বিপদ। সাথে সাথে তার মাঝে টিকা-টিপ্পনি আর তালী-পাট্টি লাগিয়ে একেবারে

ফালা ফালা করে ফেলবেন।

যাই হোক, কোরেশী সাহেব “আলা” সম্পর্কে যে কথা বলেছেন তাতেও ভাল রকমের গোজামিল রয়েছে। আসলে “আলা” শব্দটি অনেক সময় ফরজ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন, হজ্জের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, (عَلَى النَّاسِ) “মানুষের উপর আবশ্যিক দায়িত্ব” [আলে ইমরান/৯৭] তবে সব সময় যে এমন বোঝায় তা নয় যেমন একটি হাদীসে এসেছে, (حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ) “মুসলিমের উপরে মুসলিমের দায়িত্ব পাঁচটি” তার পর সালামের উত্তর দেওয়া, রোগীকে দেখতে যাওয়া, জানাযার সাথে যাওয়া, দা’ওয়াত কবুল করা, কেউ হাঁচি দিয়ে আল-হামদু লিল্লাহ বললে, তার উত্তর দেওয়া ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। [বুখারী ও মুসলিম] এখানে ‘আলা’ (عَلَى) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তবে জানা কথা যে, এর সবই ফরজ নয়। অন্য হাদীসে এসেছে, রসুলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে বলেন, (عَلَيْكَ بِصِيَامِ ثَلَاثِ عَشْرَةٍ، وَأَرْبَعِ عَشْرَةٍ، وَخَمْسِ عَشْرَةٍ) “তোমার উপর দায়িত্ব হলো, মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রোজা রাখা। [নাসায়ী] এখানেও ‘আলা’ শব্দ আছে কিন্তু প্রতি মাসে এই তিন দিন রোজা রাখা ফরজ নয়। বুখারী ও মুসলিমের একটি হাদীসে এসেছে, সামর্থ থাকলে বিবাহ করার নির্দেশ দেওয়ার পর রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصُّومِ) “আর যার সামর্থ নেই তার উপর দায়িত্ব হলো রোজা রাখা” এই হাদীসেও আলা ‘عَلَى’ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু এই হাদীসের উপর ভিত্তি করে যেসব যুবক ছেলে অর্থের অভাবে বিবাহ করতে পারে না তাদের উপর বিবাহের আগ পর্যন্ত প্রতিটি দিন রোজা রাখা ফরজ এমন বলা সঙ্গত হবে কি? আসল কথা হলো ‘আলা’ মানে দায়িত্ব বোঝায়। কখনও তা আবশ্যিক দায়িত্ব তথা ফরজ বোঝায় আবার কখনও বোঝায় ইচ্ছাধীন দায়িত্ব তথা নফল বা সুন্নাত। এখন পাঠক চিন্তা করে দেখুন, অন্য সকল আয়াত ও হাদীস থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে কেবল ‘আলা’ শব্দের উপর নির্ভর করে ধনী গরীব সকল মুসলিমের উপর যাকাত আবশ্যিক করা যৌক্তিক মনে হয় কি?

এখানেই শেষ নয়। যে হাদীসে ‘আলা’ বলা হয়েছে সেই হাদীসের পরের অংশ পাঠ করলেও বোঝা যায় কোরেশী সাহেব হাদীসটির ভুল ব্যাখ্যা করেছেন। হাদীসে প্রথমেই বলা হয়েছে, রসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, “প্রতিটি মুসলিমের উপর সাদকা দেওয়া দায়িত্ব”। এটা শুনে সাহাবায়ে কিরাম বললেন, (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ) “যদি কারো সামর্থ না থাকে?”। রসুলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন, “يَعْمَلُ يَدِهِ، فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ” সে হাতে খেটে কামাই করবে এবং নিজের প্রয়োজন মেটাতে আর সাদকা করবে”। সাহাবায়ে কিরাম প্রশ্ন

করলেন, যদি কেউ তাও করতে না পারে? রসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, (يَعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ) “কারো সমস্যার সময় তাকে সাহায্য করবে”। সাহায্যে কিরাম বললেন, যদি তাও করতে না পারে? রসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, (فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ، وَيُتِمِّسِكَ عَنِ الشَّرِّ، فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ) “সে ভাল আমল করুক আর খারাপ আমল থেকে দূরে থাকুক এটাই তার সদকা হয়ে যাবে”।

ফারুকী ফিতনার জবাব নামক গ্রন্থের ৩৫ পৃষ্ঠায় এবং আল্লাহ প্রদত্ত অর্থনীতির ৪২ পৃষ্ঠায় কোরেশী সাহেব নিজেও হাদীসটির সম্পূর্ণ অনুবাদ পেশ করেছেন। যদিও হাদীসটির মাঝে মধ্যে তিনি কিছু টিকা-টিপ্পনী যোগ করেছেন। অনুবাদে প্রথমেই তিনি বলেছেন, “প্রতিটি মুসলমানের উপর সদকা (যাকাত) অবশ্য কর্তব্য (ফরজ)।” দেখা যাচ্ছে তিনি সদকার অর্থ করেছেন যাকাত এবং পরে ‘আলা’ শব্দের অর্থ লিখেছেন অবশ্য কর্তব্য। এতেও তার শান্তি হয়নি তাই তার পাশে আবার লিখে দিয়েছেন ফরজ। কথাই বলে, খাবো যখন ফ্রী, তখন কম কেনো করি। ব্যাখ্যা লিখতে যেহেতু তার দলীল প্রমাণ লাগছে না তাই নিজের পক্ষে মন মতো যা খুশি লিখে দেওয়ার ব্যাপারে তিনি কমতি করবেন কেনো? সে তিনি যা খুশি লিখতে পারেন। কিন্তু বুদ্ধিমান পাঠকের উচিত তার ব্যাখ্যা কতদূর সঠিক তা ভেবে দেখা।

হাদীসটির উপর সামান্য চিন্তা-গবেষণা করলেই বোঝা যাবে হাদীসটি কোরেশী সাহেবের পক্ষে নয় বরং বিপক্ষে দলীল। যেহেতু এখানে প্রথমে প্রতিটি মুসলিমের উপর সদকা দেওয়া আবশ্যিক এটা বলার পরই যে তা করতে সক্ষম নয় তার ব্যাপারে বলা হয়েছে (يَعْمَلُ بِيَدِهِ، فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَصَدِّقُ) “সে হাতে খেটে কামাই করবে এবং নিজের প্রয়োজন মেটাতে আর সদকা করবে”। এই হাদীস প্রমাণ করে যারা হাতে খেটে টাকা কামাই করে তাদের উপর সদকা আবশ্যিক নয় বরং নফল। যেহেতু এখানে হাতে খেটে কামাই করার পর কি করতে হবে সে সম্পর্কে বলা হচ্ছে, (فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَصَدِّقُ) সে নিজের জন্য ব্যয় করবে এবং সদকা করবে” অর্থাৎ প্রথমে নিজের জন্য ব্যয় এবং পরে সদকা করবে এমন বলা হয়েছে। এতে বোঝা যায় এটা সাধারণ দান। যেহেতু ফরয যাকাত হলে তা আগেই আদায় করতে হতো। কোরেশী সাহেব নিজেই বলেন, “উৎপাদিত ফসল বা অর্জিত ধন সম্পদ বা টাকা পয়সার সর্ব প্রথম যাকাত প্রদান করিয়া তারপর অন্যান্য হক আদায় করিতে হইবে” [আল্লাহ প্রদত্ত অর্থনীতি ২৮ পৃষ্ঠা]

হাদীসের শেষে এমনকি অন্যকে সহযোগিতা করা এবং ভাল আমল করাকেও সদকা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তাহলে এটাই প্রমাণিত হয় যে, আর্থিকভাবে সদকা



আদায় করা প্রতিটি মুসলিমের দায়িত্ব নয়। বরং অবস্থাভেদে কারো উপর অর্থ দান করা দায়িত্ব আবার কারো উপর তা দায়িত্ব নয় তবে নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে অবশিষ্ট থাকলে সদকা করা উচিত। কেউ আবার কোনো অর্থই দান করবে না কেবল অন্যকে সহযোগিতা বা ভাল আমল করবে। এটাই হলো, হাদীসের বক্তব্য। এখন প্রশ্ন হলো, কোরেশী সাহেব ও তার অনুসারীরা যখন বলেন, প্রতিটি মুসলিমের উপর সদকা বা যাকাত ফরজ তখন তাদের উদ্দেশ্য কি থাকে? তারা কি এটাই বোঝাতে চান যে, অবস্থা অনুযায়ী কেউ অর্থ-সম্পদ দান করবে আর কেউ কোনো অর্থ সম্পদ দান না করে কেবল অন্যকে সহযোগিতা করবে বা ভাল আমল করবে? যদি তাই হয় তবে তো অন্যান্য মুসলিমদের সাথে তাদের কোনো বিরোধ নেই। যেহেতু সকল মুসলিমরাই এমনটাই মনে করে। আর যদি তাদের উদ্দেশ্য হয় প্রতিটি মুসলিমের উপর আর্থিকভাবে যাকাত ফরজ তাহলে এই হাদীস তাদের পক্ষে নয় বরং বিপক্ষে দলীল।

কোরেশী সাহেব অবশ্য হাদীসটি উল্লেখ করার পর সতর্ক করে বলেছেন, “এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে যাহার আর্থিক ক্ষমতা বা উপার্জন আছে সে দুর্যোগগ্রস্থ ব্যক্তিকে দৈহিক সাহায্য করিয়া বা সৎ উপদেশ দান করিয়া সদকা বা যাকাত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না। [আল্লাহ প্রদত্ত অর্থনীতি ৪২]

দেখা যাচ্ছে কোরেশী সাহেব উপার্জনের ক্ষমতা যার আছে তার উপর আর্থিক যাকাতই আবশ্যিক করেছেন। এখন লক্ষণীয় বিষয় হলো, উক্ত হাদীসে এক পর্যায়ে বলা হয়েছে, (يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ) “সমস্যায় পতিত ব্যক্তিকে সহযোগিতা করবে।” এর অনুবাদে কোরেশী সাহেব বলেছেন, “সে কোন দুর্যোগগ্রস্থ ব্যক্তিকে (দৈহিকভাবে) সাহায্য করবে” [উক্ত গ্রন্থের ৪২ পৃষ্ঠা]। এখন প্রশ্ন হলো, যে ব্যক্তি অন্যকে দৈহিকভাবে সহযোগিতা করতে পারছে সে কি গায়ে খেটে উপার্জনে সক্ষম নয়? মাগনা খাটতে পারবে আর উপার্জন করতে পারবে না। যদি কেউ বলে, দৈহিকভাবে সক্ষম ব্যক্তি যদি কোনো দিন কাজ না পায় তার ক্ষেত্রে উপরোক্ত বিধান প্রযোজ্য। তার কাছে প্রশ্ন হলো, তবে কি দিনমুজুররা কোনো কারণে মাঝে মাঝে কাজ না পেলে সেদিন বাড়িতে বসে একটু জিড়িয়ে নেওয়ার বদলে অন্য লোকের বেগার দেবে? মানুষের উপর এত জুলুম করার আদৌ কোনো প্রয়োজন আছে কি?

এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় উপার্জনে সক্ষম প্রতিটি ব্যক্তির উপর যাকাত প্রদান করা আবশ্যিক হাদীস দ্বারা তা প্রমাণ করা যায় না বরং তার বিরুদ্ধে প্রমাণ পাওয়া যায়। যেহেতু এখানে দৈহিকভাবে সক্ষম ব্যক্তিও আর্থিকভাবে যাকাত আদায় না করে অন্যকে

সহযোগিতা করবে এমন বলা হয়েছে। অন্য হাদীসে এমনকি উপার্জন করার পরও যাকাত না দেওয়ার পক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়।

আনাস ইবনে মালিক একদল সাহাবীর বর্ণনা দিয়ে বলেন,

وَيَحْتَطِبُونَ فَيَبِيعُونَهُ، وَيَشْتَرُونَ بِهِ الطَّعَامَ لِأَهْلِ الصُّفَّةِ وَلِلْفُقَرَاءِ

তারা কাঠ কুড়িয়ে বিক্রয় করতো এবং তা দ্বারা বাস্তবীন আহলে সুফফা ও অভাবীদের জন্য খাবার ক্রয় করতো। [মুসলিম]

হাদীসে এও বলা হয়েছে যে পরবর্তীতে তারা শহীদ হোন এবং তাদের প্রতি মহান আল্লাহ সন্তুষ্ট হোন।

দেখা যাচ্ছে এই সকল সাহাবারা দৈনন্দিন যা উপার্জন করতেন তার সবই বাস্তবীন ও অভাবীদের জন্য খাদ্য ক্রয়ে ব্যয় করতেন। লক্ষণীয় বিষয় হলো, কোরেশী সাহেবের মতে ফরজ যাকাত নিজেই অভাবীদের মাঝে বন্টন করে দেওয়া যায় না। তিনি বলেন, “যাকাত নিজের হাতে দান না করিয়া প্রকাশ্যে একজন ধর্মীয় নেতার হাতে প্রদান করিতে হইবে” [আল্লাহ প্রদত্ত অর্থনীতি পৃষ্ঠা ২৩] উক্ত গ্রন্থের ৬ নং পৃষ্ঠায় তিনি বলেছেন, ধর্মীয় নেতার হাতে প্রদান না করলে যাকাত আদায় হবে না। কিন্তু হাদীসে দেখা যাচ্ছে এই সকল সাহাবায়ে কিরাম উপার্জিত সম্পদের সবটুকু অভাবীদের জন্য খাদ্য সংগ্রহে ব্যয় করেছেন। রসুলুল্লাহ ﷺ বা তার পক্ষ থেকে কোনো আমেলের হাতে কিছুই প্রদান করেনি। অতএব ফারুক কোরেশীর মতে তারা ফরজ যাকাত আদায় করেননি। প্রশ্ন হলো, তাহলে তাদের উপর মহান আল্লাহ সন্তুষ্ট হলেন কিভাবে? এটাই প্রমাণ করে ফারুক কোরেশীর মত ভ্রান্ত।

অন্য একটি হাদীসে এসেছে, রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

لَأَنْ يَحْمِلَ الرَّجُلُ حَبْلًا فَيَحْتَطِبَ ثُمَّ يَجِيءَ فَيَضَعُهُ فِي السُّوقِ فَيَبِيعُهُ، ثُمَّ يَسْتَعْفِي بِهِ فَيَنْفِقَهُ عَلَى نَفْسِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ

তোমাদের মধ্যে কেউ একজন দড়ি নিয়ে গিয়ে কাঠ কুড়িয়ে এনে বাজারে তা বিক্রয় করে নিজের প্রয়োজন মেটাতে এবং নিজের উপর তা ব্যয় করবে এটা মানুষের নিকট চেয়ে বেড়ানোর চেয়ে উত্তম। [আহমাদ]

এই হাদীসে কাঠ কুড়িয়ে এনে নিজের উপর ব্যয় করাকেই উত্তম বলা হয়েছে। এই হাদীসের কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, (فَيَحْتَطِبُ، فَيَبِيعُ، فَيَأْكُلُ وَيَصَدَّقُ) “কাঠ সংগ্রহ করে তা বিক্রয় করে খাবে ও সদকা করবে”। [বুখারী] কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে,

(فَيَأْكُلُ أَوْ يَتَصَدَّقُ) “খাবে অথবা সদকা করবে”। [আহমাদ] কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে (فَيَبِيعُهُ فَيَأْكُلُ) “বিক্রয় করে খেয়ে নেবে”। [আহমাদ] কোরেশী সাহেব এর মধ্যে কেবল খাবে ও দান করবে এই বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন আর বাকীগুলো গোপন করেছেন। কিন্তু তিনি লক্ষ্য করেননি যে, সেখানেও বলা হয়েছে খাবে ও দান করবে। অর্থাৎ খাওয়ার কথা আগে বলা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় এই দান ফরজ যাকাত নয়। যেহেতু কোরেশী সাহেবের মতে ফরজ যাকাত সবার আগে আদায় করতে হয়। পরে অন্যান্য খরচ করতে হয়। তাহলে তার মতেও এখানে ব্যক্তিগত সদকাই বোঝা উচিত। যাই হোক সব বর্ণনা একত্রিত করলে বোঝা যায় এটা নফল দান। সে চাইলে করতে পারে চাইলে নাও করতে পারে। একারণে অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে “খাবে অথবা দান করবে”। অর্থাৎ যে কোনো একটি করতে পারবে।

এসব হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় গায়ে খাটা গরীব মানুষরা ফরজ যাকাত আদায় করতে বাধ্য নয় বরং উপার্জিত সম্পূর্ণ সম্পদ নিজেদের উপর ব্যয় করতে পারে আবার ইচ্ছা করলে তার কিছু অংশ বা সম্পূর্ণ অংশ ব্যক্তিগতভাবে অভাবীদের মাঝে দানও করতে পারে। এ কথার সুস্পষ্ট অর্থ হলো, ফরজ দান বা যাকাত কেবল ধনীদের উপর গরীবদের উপর নয় তবে গরীবরা ইচ্ছা করলে বা সামর্থ্য থাকলে স্বেচ্ছায় দান করতে পারে।

অন্য হাদীসে একথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে, أَنُفُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْذَرَاجَاتِ (الْغُلَى) “গরীব মুহাজিররা রসুলুল্লাহ ﷺ এর নিকট এসে বলল, সম্পদশালীরা তো উঁচু স্থান হাসিল করে নিলো।” রসুলুল্লাহ ﷺ ব্যাপার কি জানতে চাইলে তারা বললেন, (يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا نَتَصَدَّقُ، وَيُعْتِقُونَ وَلَا نُعْتِقُ) “আমরা যেমন নামাজ পড়ি তারাও পড়ে আর আমরা যেমন রোজা রাখি তারাও রাখে তবে তারা সদকা দেয় আর আমরা সদকা দিই না। তারা দাস মুক্ত করে আমরা দাস মুক্ত করি না।” এটা শুনে রসুলুল্লাহ ﷺ তাদের বললেন, (أَفَلَا أَعْلَمُكُمْ شَيْئًا تَذْكُرُونَ بِهِ مِنْ سَبْقِكُمْ) “তোমাদের কি এমন কিছু শিখিয়ে দেবো যার মাধ্যমে যারা তোমাদের চেয়ে এগিয়ে গিয়েছে তাদের নাগাল পাবে”? পরে তিনি তাদের একটি দোয়া শিখিয়ে দেন। [মুসলিম] লক্ষণীয় বিষয় হলো, গরীব ও অভাবী সাহাবীরা রসুলুল্লাহ ﷺ এর সামনে এসে বলল, ধনী-গরীব সবাই নামাজ-রোজা করে ঠিকই কিন্তু ধনীরা সদকা দেয় আর আমরা দিই না। এভাবে তো তারা এগিয়ে যাচ্ছে। রসুলুল্লাহ ﷺ তাদের কথা মেনে নিয়ে একটা দোয়া শিখিয়ে দিলেন যাতে সদকা না করেও তাদের নাগাল পাওয়া যায়। অথচ ফারুক কোরেশী আর তার

অনুসারীরা বলছে, নামায রোজার মতই ধনী গরীব সবাইকে যাকাত দিতে হবে।

অন্য হাদিসে আরো স্পষ্ট করে রসুলুল্লাহ ﷺ মানুষকে প্রথমে ঈমান ও নামাজের দাওয়াত দেওয়ার পর বলতে বলেন, (أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ) “আল্লাহ তাদের উপর এমন সদকা ফরজ করেছেন যা তাদের মধ্যকার ধনীদের নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে আর গরীবদের নিকট ফিরিয়ে দেওয়া হবে।” [বুখারী ও মুসলিম]

এই হাদীসটি উল্লেখ করার পর কোরেশী সাহেব বলেন, “উল্লেখিত হাদিসে যাকাতও এক প্রকার সদকা যা নামাজের মত সকলের উপরই ফরজ বলিয়া বোঝা যায় এবং এখানে দরিদ্র বা অভাবীকে সদকা বা যাকাত প্রদান করিতে হইবে না এরূপ বলা হয় নাই। বরং ধনী বা স্বচ্ছল ব্যক্তিদিগকে যাকাত তহবিল হইতে কিছু দিতে হইবে না। কিন্তু দরিদ্র বা অভাবী সদকা বা যাকাত প্রদান করিলে তাহাদের অভাব পূরণের জন্য ফেরত দেওয়া হইবে। [আল্লাহ প্রদত্ত অর্থনীতি ৪২ পৃষ্ঠা]

কোরেশী সাহেবের এই কথার মধ্যে বেশ কিছু উদ্ভট ও অসঙ্গত দাবী রয়েছে। তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা আজব বিষয়টি হলো, হাদীস থেকে তিনি বুঝেছেন যাকাতও নামাজের মতো সকলের উপর ফরজ। প্রশ্ন হলো, হাদীসের কোথায় এমন কথা লেখা আছে? এই ব্যাখ্যা কি তিনি স্বপ্নে পেয়েছেন নাকি কেবল নামাজের পরই যাকাতের উল্লেখ দেখে তার মনে হয়েছে নামাজের মতোই যাকাত সকল মুসলিমের উপর ফরজ হওয়া উচিত? যদি তাই হয় তবে নামাজের মতোই দৈনিক পাঁচবার যাকাত দিতে বলেন না কেনো? এমন উদ্ভট কথার যারা অনুসরণ করে তাদের জন্য সত্যিই দুঃখ হয়।

পরে তিনি বলেন, “এখানে দরিদ্র বা অভাবীকে সদকা বা যাকাত প্রদান করিতে হইবে না এরূপ বলা হয় নাই।” এই কথাটিও আশ্চর্যজনক। রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “যাকাত ধনীদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে আর গরীবদের মাঝে ফেরত দেওয়া হবে।” “ধনীদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে” কথাটা থেকে গরীবদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে না এটা যে লোক বোঝে না তাকে কি সুস্থ মানুষ বলা যায়? মহান আল্লাহ হজ্জের বিধান সম্পর্কে বলেন, (مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) “যে রাস্তার খরচ বহন করতে পারে” [আলে ইমরান/৯৭] অর্থাৎ যে রাস্তার খরচ বহন করতে পারে তার উপর হজ্জ ফরজ এটা বলেছেন কিন্তু যে রাস্তার খরচ বহন করতে পারে না তার যে হজ্জ করা লাগবে না এটা স্পষ্ট করে বলেননি। তাই বলে কি এমন বলা যাবে যে, আয়াতে যে খরচ বহন করতে পারে না সে হজ্জ করবে না এটা তো বলা হয়নি তাই রাস্তার খরচ বহন করতে

পারুক বা না পারুক যে কোনো অবস্থায় হজ্জ করতে হবে। আসলে এসব হলো বক্রতা। সুস্থ বিবেক সম্পন্ন যে কোনো মানুষ বুঝবে রাস্তার খরচ যে বহন করতে পারে সে হজ্জ করবে এর অর্থই হলো যে খরচ বহন করতে পারে না সে হজ্জ করবে না। এটা আলাদা করে বলার প্রয়োজন নেই। একইভাবে ধনীরা যাকাত দেবে এর অর্থই হলো গরীবরা দেবে না। এটা নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই।

অনেকে এখানে “গরীবদের যাকাত ফিরিয়ে দেওয়া হবে” এই কথাটি নিয়ে বেশ জটিলতা সৃষ্টি করেন। তারা বলেন, কোনো জিনিস যার থেকে আসে তাকেই প্রদান করাকে ফিরিয়ে দেওয়া বলে। অতএব, যদি গরীবদের নিকট থেকে যাকাত গ্রহণ নাই করা হয় তবে তাদের নিকট ফেরত দেওয়ার কথা কেনো বলা হলো? কোরেশী সাহেবের কথার মধ্যেও ফেরত শব্দের এই অর্থের দিকে আকার-ইঙ্গিত রয়েছে। কুতর্কের এটিও একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। যেখানে হাদীসে সরাসরি বলা হচ্ছে যাকাত গ্রহণ করা হবে ধনীদের নিকট থেকে সেখানে ফেরত শব্দের মারেফতী ব্যাখ্যার মাধ্যমে হাদীসের স্পষ্ট অর্থকে বাতিল করার চেষ্টা করেছে। অথচ আরবী রদ (১) শব্দ সব সময় ফেরত অর্থে ব্যবহৃত হয় না বরং কখনও কখনও কেবল পৌঁছে দেওয়া বা অর্পণ করা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কুরআনের অভিধানের ৩৫৩ পৃষ্ঠায় কোরেশী সাহেব নিজেই এসব অর্থ উল্লেখ করেছেন। পবিত্র কুরআনেও এর স্বপক্ষে বহু সংখ্যক আয়াত রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, যারা পবিত্র কুরআনের কিছু অংশ স্বীকার করে আর কিছু অংশ অস্বীকার করে তাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, (وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ) “তাদের কিয়ামতের দিন কঠিন আযাবের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে” [বাকারা/৮৫] এখানে রদ তথা ফিরিয়ে দেওয়া শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। এর অর্থ কি এই যে এসব লোকেরা আগেও জাহান্নামে ছিলো। আসলে এর অর্থ হলো, পৌঁছে দেওয়া। অন্য আয়াতে মানুষকে উত্তম গঠনে সৃষ্টি করা হয়েছে এটা বলার পর বলা হয়েছে, (ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ) “পরে আমি তাকে সর্বনিম্ন স্তরে ফিরিয়ে দিয়েছি।” [সূরা তীন/৫] কোরেশী সাহেব এর অনুবাদ করেছেন, “নিম্ন থেকে নিম্নতর অবস্থায় ফিরাইয়া (পৌছাইয়া) দিই।” [কুরআনের অভিধান/৩৫৩] অর্থাৎ তিনি (১) শব্দের অর্থ করেছেন পৌঁছে দেওয়া। এমন আরো অনেক আয়াত রয়েছে তবে তা এখানে বিস্তারিত উল্লেখ করা সম্ভব নয়। এখানে আরো একটি বিষয় রয়েছে, কোনো জিনিসকে কোথাও ফিরিয়ে দেওয়া অর্থ যার নিকট থেকে এসেছিলো তাকেই ফেরত দেওয়া বোঝায় না বরং অনেক সময় যেদিক থেকে এসেছিলো সেই দিকে ফেরত দেওয়াও বোঝায়। উদাহরণ স্বরূপ, ত্রিকোট

খেলার সময় আমরা দেখি ব্যাটসম্যান বলে আঘাত করলে ফিল্ডার তা ধরে ফিরিয়ে দেয়। এর অর্থ কিন্তু এই নয় যে, ফিল্ডার বলটা যে মেরেছে তাকে তথা ব্যাটসম্যানকে ফেরত দেয় বরং সে কিপারকে ফেরত দেয়। দেখা যাচ্ছে ফেরত দেওয়া মনেই যার নিকট থেকে আসছে তাকেই ফেরত দিতে হবে এমন নয় বরং যে স্থান থেকে আসছে সেই স্থানের অন্য কারো নিকট ফেরত দিলেও হয়। হাদীসেও এই অর্থই উদ্দেশ্য। যে এলাকা থেকে যাকাত গ্রহণ করা হচ্ছে ঐ এলাকার গরীবরাই আবার তাতে ভাগ পাবে ফলে যেখান থেকে সম্পদ এসেছে সেখানেই ফিরে যাবে এটা বোঝানোর জন্যই এখানে রদ (১) তথা ফেরত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু যাদের অন্তরে বক্রতা আছে তারা এখানে ভুল ব্যাখ্যা করে ফিতনার সৃষ্টি করতে চাচ্ছে। মহান আল্লাহ মুসলিম উম্মাহকে এসব ফিতনাবাজ লোকদের হাত থেকে রক্ষা করুন। আমীন।

কোরেশী সাহেব, অন্য একটি হাদীস থেকে রদ শব্দের এই অর্থটি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। সেখানে নারী, পুরুষ, ছোট বড় সকল মুসলমানের উপর ফিতরা আবশ্যিক এটা বলার পরই বলা হয়েছে, (أَمَّا غَيْرُكُمْ فَيَرْكَبُ اللَّهُ، وَأَمَّا فُقَيْرُكُمْ، فَيَرُدُّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا ) (أُعْطِيَ “তোমাদের মধ্যে যে ধনী তাকে আল্লাহ পবিত্র করবেন আর যে গরীব সে যা প্রদান করেছে তার চেয়ে বেশি তাকে ফেরত দেওয়া হবে। [আবু দাউদ] ধনীদের নিকট থেকে যাকাত গ্রহণ করা হবে আর দরিদ্রদের ফেরত দেওয়া হবে এই হাদীসের ব্যাখ্যায় কোরেশী সাহেব বলেন, “যাহার মর্ম যাকাতুল ফিতরের হাদীস দ্বারা সম্পূর্ণ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে যে, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে আদায় করিয়া দরিদ্রগণকে তাহাদের চাহিদা অনুযায়ী বেশি করিয়া ফিতরত দিতে হইবে”। [ফারুকী ফিতনার জবাব পৃষ্ঠা ৩৭] পরে তিনি গর্ব করে বলেন, “কুরআন-হাদীস ব্যাখ্যার নিয়মই হইল এক আয়াতের ব্যাখ্যা অপর এক আয়াত বা হাদীস দ্বারা বা এক হাদিসের ব্যাখ্যা অপর হাদীস বা কোরানের কোনো আয়াত দ্বারা করা।” অর্থাৎ এখানে একটি হাদীসের ব্যাখ্যায় আরেক হাদিস জুড়ে দিতে পরে তিনি বেশ আনন্দিত হয়েছেন। যদিও তার এই ব্যাখ্যার মধ্যেও বড় রকমের গোজামিল রয়েছে। প্রথমত ফিতরার হাদীসটি যযীফ হাদিস। আর বলা বাহুল্য যে সহীহ হাদীসের বদলে যযীফ হাদীসকে ব্যাখ্যা হিসেবে গ্রহণ করা বোকামী। সেটা বাদ দিলেও এখানে মূল যে বোকামীটা তিনি করেছেন তা হলো ফিতরার হাদীস দ্বারা তিনি উপার্জনের যাকাতের ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। অথচ ফিতরার সাথে উপার্জনের যাকাতের কোনো দিক থেকেই মিল নেই। ফিতরার যাকাতে আড়াই পারসেন্ট দিতে হয় না। টাকা-পয়সা, ফল-ফসল, পশুপাল ইত্যাদি সম্পদ কতটুকু অর্জন হয়েছে বা কতটুকু গচ্ছিত হয়েছে তার উপর ফিতরার পরিমাণ নির্ভর করে না বরং

মাথাপিছু সবার জন্য এক সা খেজুর বা অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য প্রদান করতে হয়। তার সাথে ফিতরাকে মিলিয়ে দুই হাদীসের মধ্যে ব্যাখ্যা করে এত গর্ব যিনি করছেন তার নিকট প্রশ্ন হলো, তাহলে যে যাই উপার্জন করুক এক সা খেজুর বা হাফ সা গম যাকাত হিসেবে প্রদান করাই যথেষ্ট এমন কেনো বললেন না? আর একটি হাদীস দ্বারা আরেকটি হাদীসের ব্যাখ্যা করার যখন এতই সখ তখন সোনা-রোপা, ফল-ফসল ও পশুপালের ব্যাপারে সেসব হাদীস বর্ণিত আছে সেগুলোকে বাতিল করা বা জোর করে গচ্ছিত সম্পদের ব্যাপারে প্রয়োগ করার কারনটা কি? তার মতে যদি এগুলো গচ্ছিত সম্পদের ব্যাপারে প্রযোজ্যও হয় তবু সেসব হাদীস দ্বারা উপার্জিত সম্পদের হাদীসকে ব্যাখ্যা করে উভয় স্থানে নিসাব ও বছর গননা করলেই তো পারতেন। এটাই তো অধিক যৌক্তিক ছিলো। যেহেতু উপার্জিত ও গচ্ছিত সম্পদের যাকাতের মধ্যে বহু মিল রয়েছে। দুটোতেই আড়াই পারসেন্ট আবশ্যিক হয়। আর দুটোতেই সম্পদের পরিমাণ অনুযায়ী হিসাব করে যাকাত আদায় করতে হয়। মাথাপিছু গড়ে এক সা খেজুর বা হাফ সা গম আদায় করলেই হয়ে যায় না। তাহলে যার সাথে যার মিল তার সাথে তার ব্যাখ্যা না করে যার সাথে মোটে মিল নেই সেই ফিতরাকে টেনে আনার একমাত্র উদ্দেশ্যে ফিতনা সৃষ্টি করা ছাড়া আর কি হতে পারে।

এই আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় ধনী গরীব নির্বিশেষে যাকাত প্রদান করবে এই মূলনীতি ভ্রান্ত। বরং যাকাত দেবে কেবল ধনীরা। তবে কোন বিষয়ে কে ধনী তা মনগড়া ভাবে ঠিক করে নিলে হবে না বরং কুরআন-হাদীসের বক্তব্যের আলোকে বুঝে নিতে হবে। টাকা-পয়সা, ফল-ফসল, পশুপাল ইত্যাদি সম্পদের যে নিসাব হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে তার মালিক হলেই একজন ব্যক্তি শরীয়তের দৃষ্টিতে ধনী হিসেবে গণ্য হবেন এবং কুরআন হাদীসের নির্দেশিত পন্থায় তার যাকাত আদায় করতে হবে। সেক্ষেত্রে টাকা-পয়সা ও পশুপালের যাকাত নিসাব পরিমাণ হওয়ার পর বছর অতিবাহিত হলে যাকাত দিতে হবে। যেহেতু রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, (مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا ذَرَى لَهُ) “যে কেউ কোনো মাল অর্জন করে তার নিকট ঐ মালের উপর এক বছর অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তাতে যাকাত নেই। [তিরমিযী] তবে ফল-ফসলের যাকাত কর্তনের দিন আদায় করতে হবে। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন, (وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) “কর্তনের দিন তার হক আদায় করো” [আনয়াম/১৪১] এভাবে কুরআনের সাথে হাদীসের মাঝে সমন্বয় করে আমল করতে হবে। যতটুকু কুরআন-হাদীসে বর্ণিত আছে তার মধ্যে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে সঠিক মত নির্ণয় করতে হবে। সেই সাথে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সাহাবী, তাবেরী, তাবা তাবেরী ইত্যাদি বরণ্য

ওলামায়ে কিরামের মতের অনুসরণ করতে হবে। যেহেতু রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন উম্মতের মধ্যে তারাই উত্তম। কোনো আয়াত বা হাদীসে যা আদৌ বলা হয়নি মনগড়াভাবে সেসব টিকা-টিপ্পনী কুরআন-হাদীসের মধ্যে যোগ করা মারাত্মক অন্যায়। পূর্ব যুগের যোগ্য আলেমরা যে ব্যাখ্যা করেননি নিজের মনমতো সেটার অনুসরণ করাও অনুচিত। আল্লাহ আমাদের সবাইকে রক্ষা করুন।

## ৬ নং বিভ্রান্তিঃ- যাকাত কবুল হওয়ার জন্য ধর্মীয় নেতার হাতে প্রদান করা শর্ত।

পূর্বে আমরা বলেছি যাকাতের ব্যাপারে কোরেশী সাহেবের মত হলো, “যাকাত নিজের হাতে দান না করিয়া প্রকাশ্যে একজন ধর্মীয় নেতার হাতে প্রদান করিতে হইবে” [আল্লাহ প্রদত্ত অর্থনীতি পৃষ্ঠা ২৩] তিনি আরো বলেন, “একজন ধর্মীয় নেতার হাতে অবশ্যই প্রদান করিতে হইবে নচেৎ আদায় হইবে না”। [আল্লাহ প্রদত্ত অর্থনীতি পৃষ্ঠা ৬] বলাবাহুল্য যে, একজন ইমাম (إمام) তথা ধর্মীয় নেতা থাকবে এবং তার পক্ষ থেকে আমেলরা যাকাত কালেকশন করে তারই নির্দেশে পরবর্তীতে অভাবীদের মাঝে প্রয়োজন অনুসারে বন্টন করে দেবে এই চিন্তাধারা নিঃসন্দেহে সঠিক ও সুন্দর। ব্যক্তিগতভাবে যে যার মতো যাকাত আদায় করার চেয়ে এভাবে সম্মিলিতভাবে যাকাত আদায় করলে নিঃসন্দেহে অধিক ফায়দা পাওয়া যায়। একারণে রসুলুল্লাহ ﷺ নিজেও এভাবে যাকাত আদায় করেছেন। ইবনে মুনযির বলেন,

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الزَّكَاةَ كَانَتْ تَدْفَعُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلِرَسُولِهِ وَعَمَلِهِ، وَإِلَى مَنْ أَمَرَ بِدَفْعِهَا إِلَيْهِ  
আলেমরা ইজমা করেছেন যে, যাকাত রসুলুল্লাহ ﷺ এবং নিকট এবং তিনি যেসব আমেল বা দূত পাঠাতেন এবং যাদের নিকট যাকাত প্রদান করার নির্দেশ দিতেন তাদের নিকটই যাকাত প্রদান করা হতো। [আল-ইজমা]

মহান আল্লাহও এদিকে ইঙ্গিত করে বলেন, (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً) “হে নবী আপনি তাদের সম্পদ হতে সদকা গ্রহণ করুন” [তাওবা/১০৩]

অতএব, সম্মিলিতভাবে যাকাত আদায় করে সুষ্ঠুভাবে বন্টন করাই যে উত্তম তা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু এক্ষেত্রে দুটি বিষয়ে আমাদের আপত্তি রয়েছে।

**একঃ** কাউকে ধর্মীয় নেতা মেনে নিয়ে অভাবীদের মধ্যে সুন্দরভাবে বন্টন করার উদ্দেশ্যে তার হাতে যাকাতের অর্থ জমা দেওয়া উত্তম তবে একজন ধর্মীয় নেতার নিকট যাকাত প্রদান না করলে যাকাত আদায়ই হবে না এই মত ভ্রান্ত। যেহেতু কুরআন



হাদীসে এর স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। রসুলুল্লাহ ﷺ এভাবে যাকাত আদায় করতেন বলে সেটা সুন্নাত বা উত্তম প্রমাণিত হয় কিন্তু ফরজ বা আবশ্যিক প্রমাণিত হয় না। যেহেতু রসুলুল্লাহ ﷺ যা কিছু করেন তার সবই ফরজ নয় বরং তার মধ্যে কিছু সুন্নাত বা নফল এমনকি বৈধও হয়। উদাহরণস্বরূপ, রসুলুল্লাহ ﷺ রাত্রে তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করতেন। বর্তমানে সকলের উপর এটা কি আবশ্যিক হবে? তাছাড়া রসুলুল্লাহ ﷺ যেভাবে বিভিন্ন স্থানে যাকাত সংগ্রহ করার জন্য আমেল পাঠাতেন সেভাবেই বিভিন্ন এলাকায় তার পক্ষ থেকে আমীর পাঠাতেন যারা সেখানে বিচার-আচার পরিচালনা করতো এবং নামাজে ইমামতি করতো। সকল মানুষ তখন রসুলুল্লাহ ﷺ এর নিয়োগ করা আমীরের পিছনে নামাজ আদায় করতো। এর অর্থ কি এই যে ধর্মীয় নেতার পক্ষ থেকে নিযুক্ত ব্যক্তির পিছনে ছাড়া নামাজ আদায় হবে না? আসল কথা হলো, রসুলুল্লাহ ﷺ কোনো কাজ করতেন বলেই তা ফরজ হয়ে যাবে এমন দাবী করা বোকামী। এটা স্বাভাবিক বুদ্ধিরও বিরুদ্ধে। যেহেতু এমন সময় আসতে পারে যখন মুসলিমদের কোনো নেতা থাকবে না। একটি হাদীসে এ বিষয়ে ভবিষ্যতবানী করা হয়েছে। হুযাইফা রা. রসুলুল্লাহ ﷺ কে প্রশ্ন করেন, (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ) “যদি মুসলিমদের কোনো জামায়াত ও ইমাম তথা ধর্মীয় নেতা না থাকে তাহলে কি করবো? রসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, (فَاعْتَرِلْ) “সকল বাতিল ফেরকা পরিত্যাগ করে মৃত্যু পর্যন্ত গাছের শিকড় কামড়ে পড়ে থাকো।” [বুখারী ও মুসলিম] দেখা যাচ্ছে ইমামের অনুপস্থিতিতে ব্যক্তিগতভাবে নির্জনে অবস্থান করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। প্রশ্ন হলো এই অবস্থায় মুসলিমরা নামাজ বা যাকাত কি আদায় করবে না? ইমাম বা ধর্মীয় নেতা নেই বলেই কি তারা নামাজ ও যাকাতের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত পরিত্যাগ করবে? বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্র বুঝবেন যে এমন করা সঙ্গত হবে না। বরং যে কোনো অবস্থায় শরীয়তের নিয়ম অনুযায়ী নামাজ ও যাকাত আদায় করে যেতে হবে।

**দুই.** ধর্মীয় নেতা বা তার পক্ষ থেকে নিযুক্ত আমেল যদি সঠিক নিয়মে যতটুকু ফরজ হয় তার চেয়ে বেশি সম্পদ দাবী করে তবে তা প্রদান করা যাবে না। একটি হাদীসে যাকাতের নিসাব ও পরিমাণ বর্ণনা করে দেওয়ার পর বলা হয়েছে, (فَمَنْ سَأَلَهَا مِنْ) (الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا، فَلْيُعْطَهَا وَمَنْ سَأَلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِ) “যদি সঠিক নিয়মে কোনো মুসলিমের নিকট তা দাবী করা হয় তবে সে তা প্রদান করবে আর যদি তার চেয়ে বেশি দাবী করা হয় তবে সে তা প্রদান করবে না। [বুখারী] এ হিসেবে বলা যায় যারা নিসাব, বছর ইত্যাদি কোনো শর্ত না মেনে ধনী গরীব সবার উপর যাকাত আবশ্যিক করে

তাদের নিকট মুসলিমরা যাকাত প্রদান করবে না। যেহেতু তারা ফরজের চেয়ে অতিরিক্ত যাকাত দাবী করছে। তাছাড়া এমন লোকদের ধর্মীয় নেতা হিসেবেও মানা যায় না যেহেতু তারা সুস্পষ্ট ভ্রান্ত আকীদায় বিশ্বাসী।

## ৭ নং বিভ্রান্তিঃ- মসজিদ-মাদ্রাসায় বা যে কোনো দ্বীনী কাজে যাকাতের মাল খরচ করা।

সূরা তাওবার ৬০ নং আয়াতে যাকাতের যে আটটি খাত আছে তার মধ্যে একটি হলো, (سَبِيلَ اللَّهِ) বা ‘আল্লাহর রাস্তা’। আল্লাহর রাস্তা বলতে অনেক সময় কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করা বোঝায়। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, (يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ) “তারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে ফলে মারে ও মরে” [তাওবা/১১১] আবার অনেক সময় আল্লাহর রাস্তা বলতে আল্লাহর দ্বীনকে বোঝায়। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, (يُصَدُّونَ) “তারা আল্লাহর রাস্তা থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখে এবং তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করে”। [আ’রাফ/৪৫] এখানে আসলে আল্লাহর দ্বীনের যে কোনো কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখার নিন্দা করা হয়েছে। এ হিসেবে যেহেতু আল্লাহর রাস্তা বলতে যে কোনো দ্বীনী কাজকে বোঝায় তাই কোরেশী সাহেব সুযোগ গ্রহণ করতে ছাড়েননি। তিনি এখানে অর্থ করেছেন, “মসজিদ, মাদ্রাসা, ধর্মীয় প্রতিনিধিদের খরচ খরচা, যুদ্ধ বিগ্রহ ইত্যাদি” [ফারুকী ফিতনার জবাব/৩৪] তার এই ব্যাখ্যা ভ্রান্ত। বরং সঠিক মত হলো, এখানে আল্লাহর রাস্তা বলতে কেবল যুদ্ধ-বিগ্রহ বুঝতে হবে যেহেতু আয়াতে আমভাবে আল্লাহর রাস্তা বলা হলেও হাদীসে খাসভাবে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধের কথা বলা আছে। রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, (لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِعَبْدٍ إِلَّا لِحِمْسَةٍ) “পাঁচজন ব্যক্তি ছাড়া কোনো ধর্মীর জন্য যাকাতের মাল বৈধ নয়।” তারা হলো, ১. (عامل) আমেল, ২. (غازٍ) গাজি, ৩. (في سَبِيلِ اللَّهِ) “আল্লাহর রাস্তায় যোদ্ধা, ৪. যে ধনী জাকাতের মাল ক্রয় করে, ৫. যদি কোনো ধনী কোনো অভাবীর কাছ থেকে যাকাতের মাল হাদীয়া স্বরূপ পায় এবং ৬. ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি। [সুনানে ইবনে মাযা] দেখা যাচ্ছে, যে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে সে ধনী হলেও ‘ফী সাবিলিল্লাহ’র খাত থেকে অংশ পাবে। হাদীসে ‘ফী সাবিলিল্লাহ’র খাতে যোদ্ধা ছাড়া অন্য কোনো ধর্মীয় কাজে লিপ্ত ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হয়নি। এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, যোদ্ধা ছাড়া অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিনিধি বা ধর্মের প্রচারক ধনী হলে সে ফী সাবিলিল্লাহর খাত থেকে অংশ পাবে না। তবে গরীব হলে বা আমেল হলে বা অন্য কোন খাতের সদস্য হলে সে ঐ খাত থেকে পেতে পারে। সেক্ষেত্রেও তাকে ‘আল্লাহর রাস্তা’ নামক খাতটির মধ্যে ঢুকানো যাবে না। বরং অন্য কোনো খাতে ঢুকতে

হবে। এ থেকে প্রমাণিত হয় আল্লাহর রাস্তা কথাটি থেকে যে কোনো প্রকার দ্বীনী কাজ বোঝা স্পষ্ট ভ্রান্তি। কোরেশী সাহেব নিজেও এক্ষেত্রে দ্বিমুখীতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি আল্লাহর রাস্তার ব্যাখ্যায় মসজিদ মাদ্রাসার সাথে ধর্মীয় প্রতিনিধিদের কথাও উল্লেখ করেছেন। এ থেকে বোঝা যায় ধর্মীয় প্রতিনিধীরা যাকাতের অর্থ থেকে গ্রহণ করতে পারবে। অথচ আল্লাহ প্রদত্ত অর্থনীতির ৩৪ পৃষ্ঠায় তিনি লেখেন, “ধর্মীয় নেতা অভাবী হইলে প্রয়োজন মতো যাকাত তহবিল হইতে অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন” দেখা যাচ্ছে তিনি ধর্মীয় নেতার ক্ষেত্রে অভাবী হওয়া শর্ত করছেন অর্থাৎ ধর্মীয় নেতাকে ‘ফী সাবিলিল্লাহ’ তথা আল্লাহর রাস্তার খাত থেকে না দিয়ে ফকীর-মিসকীন তথা অভাবী মানুষের খাত থেকে প্রদান করার কথা বলেছেন। যেহেতু আল্লাহর রাস্তার খাত থেকে যাকে দেওয়া হয় তার ক্ষেত্রে অভাবী হওয়া শর্ত নয়। প্রশ্ন হলো, সাধারণ ধর্মীয় প্রতিনিধীরা আল্লাহর রাস্তার খাত থেকে পেতে পারে আর তাদের চেয়েও বেশি ধর্মীয় কাজ যিনি করছেন সেই ধর্মীয় নেতা তা পেতে পারেন না কথাটা দ্বিমুখী হয়ে যায় না? এখানে আরো একটি বিষয় লক্ষণীয়, তা হলো যাকাতের যে কয়টি খাতের কথা বলা হয়েছে তার সবই কিন্তু কোনো না কোনো দিক থেকে ধর্মীয় কাজ। আল্লাহর রাস্তা বলতে যদি যে কোনো প্রকার ধর্মীয় কাজই বোঝাতো তাহলে এভাবে আটটি খাত ভাগ না করে একবারে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করো বললেই তো হতো। অতএব, অন্যান্য দ্বীনী কাজের নাম ধরে বলার পর আল্লাহর রাস্তা বলার কারণে বোঝায় যায় এখানে আমভাবে যে কোনো দ্বীনী কাজ নয় বরং বিশেষ কোনো দ্বীনী কাজকে বোঝাচ্ছে। আর হাদীস থেকে জানা যায় তা হলো যুদ্ধ করা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যদি কোনো ব্যক্তির নাম হয় ইনসান আর তার বন্ধুদের নাম হয় করিম, বকুল ও স্বপন। আমরা জানি ইনসান মানে মানুষ। এখন আমি যদি বলি জিন ও ইনসানের বিচার হবে। স্বাভাবিকভাবেই এখানে ইনসান বলতে আমি আমভাবে সকল মানুষ বুঝবো। যেহেতু মানুষের সাথে আর মানুষের বাইরের জিনিসের সাথে এখানে তুলনা করা হচ্ছে। কিন্তু যখন কেউ বলবে, করিম, বকুল ও ইনসান পাঁচ টাকা করে পাবে। তখন কিন্তু ইনসান অর্থ সকল মানুষ বুঝে সকল মানুষকে পাঁচ টাকা করে দেওয়া যাবে না। বরং ইনসান বলতে এখানে ইনসান নামের ছেলেটিকে বুঝতে হবে এবং করিম ও বকুলের সাথে তাকেও পাঁচ টাকা দিতে হবে। যেহেতু এখানে মানুষের সাথে মানুষের বাইরের কিছু তুলনা করা হচ্ছে না বরং মানুষের ভিতরে কিছু ব্যক্তির সাথে ইনসান নামটি উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহর রাস্তা শব্দটির ক্ষেত্রেও এমন কথা প্রযোজ্য। যেহেতু তার একটি অর্থ হলো, যে কোনো ধর্মীয় কাজ। কিন্তু অন্য অর্থে এটা কেবল আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধকে

বোঝায়। এখন যদি আলোচনা হয় ধর্ম আর ধর্মের বাইরের বিষয়ের সাথে তখন আল্লাহর রাস্তা বলতে সাধারণভাবে ইসলামের রাস্তা বোঝাবে কিন্তু যখন কথা হবে ধর্মের ভিতরের বিভিন্ন বিষয়ের মাঝে তখন আল্লাহর রাস্তা বলতে বুঝতে হবে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধকে। আয়াতে যদি বলা হতো যাকাতের মাল শয়তানের রাস্তায় খরচ না করে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করো তাহলে আল্লাহর রাস্তা বলতে যে কোনো ধর্মীয় কাজ বোঝাতো কিন্তু যেহেতু বলা হচ্ছে ফকীর-মিসকিন, দাসমুক্তি, ঋণগ্রস্ত ইত্যাদি ব্যক্তিকে দান করো আর আল্লাহর রাস্তায় দান করো তাই আল্লাহর রাস্তা বলতে সকল ধর্মীয় কাজ বোঝা যাবে না। তেমন হলে কষ্ট করে আগের কথাগুলো বলা হতো না এক কথায় আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করো বললেই হতো। যেহেতু আগে যেগুলো বলা হলো সবই ধর্মীয় কাজ। অতএব যাকাতের আটটি খাতের মধ্যে যে আল্লাহর রাস্তা কথাটি উল্লেখিত আছে হাদীস অনুযায়ী এবং সুস্থ চিন্তাভাবনার আলোকে প্রমাণিত হয় তার অর্থ আমভাবে সকল প্রকার ধর্মীয় কাজ বা ধর্ম প্রচার নয় বরং তার অর্থ হলো, আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করা। এ কারনে যাকাতের টাকা মসজিদ, মাদ্রাসা নির্মাণ, ধর্মীয় বই-পুস্তক ছাপানো, ধর্মীয় প্রতিনিধি ও ধর্ম প্রচারকদের খাওয়ানো ইত্যাদি কাজে ব্যয় করা যাবে না। এটা মারাত্মক ভ্রান্তি।

### ৮ নং বিভ্রান্তি:- যাকাত প্রদান না করলে কাফির হয়ে যায়।

কোরেশী সাহেবের মতে যাকাত যে দেয় না সে মুশরিক, কাফির, জালেম ইত্যাদি। তিনি বলেন, “যাহারা যাকাত প্রদান ও মানুষের হক আদায় করিবে না তাহারা কাফের ও জালেম। [আল্লাহ প্রদত্ত অর্থনীতি পৃষ্ঠা ২৩] এর দলীলে তিনি ঐ আয়াতটি উল্লেখ করেন যেখানে মৃত্যু আসার পূর্বেই সম্পদ ব্যয় করার নির্দেশ দেওয়ার পর বলা হয়েছে (وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ) “এবং যাহারা কাফের তাহরাই জালেম”। [বাকারা/২৫৪] এ থেকে কোরেশী সাহেব মনে করেছেন, যে ব্যয় করে না সে কাফের এবং জালেম। পাঠক লক্ষ্য করুন, এখানে কিন্তু স্পষ্ট করে বলা হয়নি যে যারা যাকাত দেয় না তারা কাফের। বরং প্রথমে বলা হয়েছে ব্যয় করো পরে বলা হয়েছে যারা কাফের তাহরাই জালেম। এ থেকে কোরেশী সাহেব মনে করেছেন, যে ব্যয় করে না সেই কাফের ও জালেম। এখানে উদ্দেশ্য তো এমনও হতে পারে তোমরা ব্যয় করো কিন্তু কাফিরদের তা থেকে কিছুই প্রদান করোনা যেহেতু কাফেররা খুবই জালেম। উদ্দেশ্য এমনও হতে পারে যে, তোমরা ব্যয় করলে কাফিররা তামাশা করে যেমন সূরা ইয়াসিনের ৪৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে। এমনও তো হতে পারে যে এখানে আল্লাহ বলতে চাচ্ছেন তারা

তামাশা করলেও তোমরা ব্যয় করতে থাকো। তাদের কথায় কান দিয়োনা কারণ তারা জালেম। তাহলে এতসব অর্থের মধ্যে যারা যাকাত দেয় না তারা কাফের এটাকে বাছাই করার কারণ কি? আর এমন অস্পষ্ট আয়াতের উপর ভিত্তি করে মুসলমানকে কাফির বলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় কি?

অন্য একটি আয়াত থেকেও তিনি অবশ্য দলীল দিয়েছেন। সেখানে বলা হয়েছে, (وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ\* الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ) “মুশরিকদের জন্য ধংস যারা যাকাত দেয় না আর তারা আখিরাত দিবসে অবিশ্বাসী। [হা-মীম সাজদা/৬,৭]

এই আয়াত থেকে দলীল গ্রহণ করে কোরেশী সাহেব বলেন, “যাহারা নামাজ কায়েম করে অথচ যাকাত প্রদান করে না তাহারাও মুশরিক (অর্থপূজারী) ও পরকাল দিবসে (নিশ্চিত ভাবে) অবিশ্বাসী। [ফারুকী ফিতনার জবাব/৩০] দেখা যাচ্ছে আয়াতের অর্থকে তিনি ঘুরিয়ে দিয়েছেন। আয়াতে বলা হচ্ছে যারা মুশরিক তারা যাকাত দেয় না এবং পরকালে অবিশ্বাস করে আর তিনি বলছেন যারা যাকাত দেয়া না তারা মুশরিক এবং পরকালে অবিশ্বাস করে। দুটি কথার মধ্যে যে ব্যাপক পার্থক্য আছে আশা করি বুদ্ধিমান পাঠক তা ধরতে পারবেন। আয়াতে মুশরিকদের দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে, এক. তারা যাকাত দেয় না, দুই. তারা পরকালে অবিশ্বাস করে। এর অর্থ কি এই যে যার মধ্যেই এর কোনো একটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাবে সে মুশরিক হবে? উদাহরণ স্বরূপ যদি কেউ বলে, মুরগির দুটি পা আর একটি মাথা এর অর্থ কি এই যে যার দুটি পা ও একটি মাথা আছে সে মুরগি? এ হিসেবে তো মানুষও মুরগি হয়ে যাবে। ভাষা জ্ঞানের অভাব থাকলে এমনটাই হয়। উদাহরণস্বরূপ সূরা নিসার ১০২ নং আয়াতে মহান আল্লাহ মুসলিমদের যুদ্ধের জন্য অস্ত্রপাতি সংগ্রহের নির্দেশ দেওয়ার পর বলেন, (وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ) “যারা কাফির তারা চায় তোমরা অস্ত্র ও সরঞ্জাম সম্পর্কে গাফিল হয়ে পড়ো।” [নিসা/১০২] বর্তমানে অনেক ধর্মীয় নেতা আছেন নিজের অনুসারীদের অস্ত্রপাতি ও যুদ্ধ সরঞ্জাম সম্পর্কে পুরোপুরি গাফেল রাখেন। এখন যেহেতু কাফিররা মুসলিমদের অস্ত্র সম্পর্ক গাফেল রাখতে চায় অতএব যে ধর্মীয় নেতা তার অনুসারীদের অস্ত্র সম্পর্কে গাফেল রাখে সে কাফের এমন বলা যাবে কি?

দেখা যাচ্ছে কোরেশী সাহেব বেশ কিছু অস্পষ্ট বিষয়ের উপর ভিত্তি করে মুসলমানকে কাফির প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। এটা মোটেও উচিৎ নয়। স্পষ্ট দলীল প্রমাণ ছাড়া মুসলমানদের ঈমানের উপর আঘাত হানা পুরোপুরি অন্যায্য কাজ। অথচ অন্য হাদীসে স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে, যাকাত আদায় না করলে মানুষ কাফির হয় না। হাদীসটি

এমনকি কোরেশী সাহেব নিজেও উল্লেখ করেছেন কিন্তু বুঝতে পারেননি।

সেখানে বলা হয়েছে, যারা সোনা রোপার যাকাত দেয়নি ঐ সোনা রোপা গরম করে তাদের বুকে পিঠে সেক দেওয়া হবে। বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত এমন চলতে থাকবে। সেই দিনের পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছর। পরে বলা হয়েছে, (حَتَّى يُنْظَى بَيْنَ الْعِبَادِ) এভাবে যখন সবার বিচার শেষ হয়ে যাবে তখন সে তার রাস্তা দেখতে পাবে হয়তো জান্নাতের দিকে অথবা জাহান্নামের দিকে। [সহীহ মুসলিম]

কোরেশী সাহেব হাদীসের শেষের অংশের অনুবাদ করেছেন, “অতঃপর সে তাহার পথ ধরিবে হয় জান্নাতের দিকে না হয় জাহান্নামের দিকে .....” [আব্বাহ প্রদত্ত অর্থনীতি পৃষ্ঠা ৫২]

এই হাদীস প্রমাণ করে ফরজ যাকাত যে আদায় করে না কিয়ামতদের দিন তার শাস্তি হবে বটে তবে পরবর্তীতে বিচারে সে অন্যান্য ভুল আমলের কারণে জান্নাতীও হতে পারে। তেমন কোনো ভুল আমল না থাকলে জাহান্নামীও হতে পারে। আর জানা কথা যে, কাফির কখনও জান্নাতী হয় না বরং চিরস্থায়ী জাহান্নামবাসী হয়। তাহলে প্রমাণিত হয় যাকাত যে প্রদান করে না সে কাফির নয় বরং পাপী মুসলিম।

কোরেশী সাহেবের মতবাদে এছাড়া আরো অনেক বিভ্রান্তি রয়েছে কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে সেসবের উপর বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব নয়। তার প্রয়োজনও নেই। যেহেতু যতটুকু আলোচনা হয়েছে তাতেই তার উদ্ভট চিন্তাধারা ও ভ্রান্ত মতবাদের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে বলে আশা রাখি। এখন বুদ্ধিমান পাঠক সত্য অনুধাবনে সক্ষম হলেই আমাদের চেষ্টা সার্থক হবে। মহান আব্বাহ আমাদের সবাইকে সৎ পথে পরিচালিত করুন। আমীন।

## সমাপ্ত

## লেখকের অন্যান্য বই

### # গবেষণা গ্রন্থঃ

১. আল-ইতকান ফী তাওহীদ আর-রহমান (তাওহীদ সম্পর্কে)
২. আদ-দালালাহ্ আ'লা বিদয়াতে দ্বালালাহ্ (বিদয়াত সম্পর্কে)
৩. ভেজালে মেশাল (গণতন্ত্র সম্পর্কে ইসলামের রায়)
৪. মাজহাব বনাম আহলে হাদীস
৫. আসবাবুল খিলাফ ওয়াল জাব্বু আনিল মাজাহিবিল আরবায়া (আরবী)
৬. নাফউল ফারীদ ফী জিল্লি বিদাইয়াতিল মুজতাহিদ (উসুলে ফিকহ)
৭. হুসাইন ইবনে মানছুর আল-হাল্লাজ; কথা ও কাহিনী
৮. হরিণ নয়না হুরদের কথা (জাম্মাতের স্ত্রীদের বর্ণনা)
৯. আল-ই'লাম বি হুকমিল কিয়াম (কারো সম্মানে দাঁড়ানো বা মীলাদে কিয়াম করার বিধান)
১০. চাঁদ দেখা প্রসঙ্গে
১১. ডাঃ জাকির নায়েক সম্পর্কে কিছু কথা
১২. আত-তাবঈন ফী হুকমিল উমারা ওয়াস সালাতীন
১৩. দরবারী আলেম
১৪. মারেফাত
১৫. লাইলাতুল বারায়াহ্
১৬. হিদায়া কিতাবের অপূর্ব হেদায়েত (হিদায়া কিতাবের একি হিদায়াত!!" বইয়ের জবাব)
১৭. একটি অসম বিতর্কের সুষম সমাধান
১৮. সাহ্ সিজনদা
১৯. কুরআন, হাদীস ও চার মাযহাবের মতামতের আলোকে সহজ ফারায়েজ
২০. পারিবারিক ভারসাম্য

### # রিসালাহ (সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ)ঃ

২১. ছোটদের আক্বাইদ
২২. সংক্ষেপে যাকাতের মাসয়ালা মাসায়েল
২৩. তারাবীর সলাতে পারিশ্রমিক গ্রহণের বিধান (আরবী)
২৪. মাসায়িলুল ই'তিকাফ (আরবী)
২৫. সংশয় নিরসন (জিহাদ সম্পর্কিত)

### # ইসলামী উপন্যাসঃ

২৬. আরব মরুতে শিক্ষা সফর (গণতন্ত্রের স্বরূপ উন্মোচন)
২৭. মৃত্যুদূত (মৃত্যুর ভয়াবহতা ও মৃত্যুর পরের জীবন)
২৮. কল্পিত বিজ্ঞান (বিবর্তবাদ ও নাস্তিকতার খন্ডায়ন)

২৯. পরিবর্তন (নিজের জীবন ও সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার সংকল্প)  
৩০. ছোটনের রোজী আপু (কিশোর উপন্যাস)  
৩১. সান্টু মামার স্কুল (কিশোর উপন্যাস)  
৩২. নাস্তিকতার অসারতা (গল্পের সাহায্যে নাস্তিকদের মতবাদ খন্ডায়ন)  
৩৩. বায়াত (কোন বায়াত? কিসের বায়াত?? কার হাতে বায়াত???)  
৩৪. কুরানিক চশমা  
৩৫. তওবা  
৩৬. বিবিজান হুজুরের হারানো বিদ্যা

#### # কবিতা গ্রন্থঃ

৩৭. কবিতায় জান্নাত (কবিতার ছন্দে জান্নাতের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা)  
৩৮. কল্পনায় জান্নাত (কবিতার ছন্দে জান্নাতের জীবন সম্পর্কে কল্পনা)  
৩৯. কবিতায় জাহান্নাম (কবিতার ছন্দে জাহান্নামের শাস্তির বিবরণ)  
৪০. ভন্ড হুজুর (কবিতার ছন্দে নামধারী আলেমদের ভন্ডামীর বর্ণনা)

#### # ভাষা শিক্ষাঃ

৪১. তাইসীরুল্ল কওয়ায়িদ (আরবী গ্রামার)  
৪২. আরাবিয়্যাতুল আতফাল (ছোটদের আরবী শিক্ষা)